নবম অধ্যায়
উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব
PLANT PHYSIOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ : পত্ররন্ধ্র, প্রস্বেদন, ফটোফসফোরাইলেশন, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক, পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণ, কোষ রসের আরোহণ, প্রস্বেদন ইত্যাদি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেয়েছো। এ অধ্যায়ে উক্ত প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

প্রতিটি সজীব উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে বহুবিধ শারীরতাত্ত্বিক (physiological) ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। একাধিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া মিলিতভাবে এক একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (physiological process) সম্পন্ন করে। উদ্ভিদ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হলো খনিজ লবণ পরিশোষণ, রস উত্তোলন, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, প্রস্বেদন প্রভৃতি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে তাকে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বলে।

Stephen Hales নামক একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে বলেন যে, উদ্ভিদ বায়ু থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক হয়তো এতে অংশগ্রহণ করে। এ কারণে তাঁকে **উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের** (Plant Physiology) **জনক বলা হয়**। Plant Physiology শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ *Physis* (nature) এবং *logos* (discourse) থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—
❖ উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া।
❖ আধুনিক মতবাদসহ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া।
❖ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।
❖ চিত্রসহ পত্ররন্ধ্রের গঠন।
❖ পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়ার কৌশল।
❖ পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বর্ণনা।
ব্যবহারিক :
০ পত্ররন্ধ্রের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিতকরণ।
❖ ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্র বর্ণনা।
❖ ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্রের মধ্যে তুলনা।
❖ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় লিমিটিং ফ্যাক্টরের ভূমিকা।
ব্যবহারিক :
০ সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষা।
❖ সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার বর্ণনা।
❖ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার বর্ণনা।
❖ শিল্পে অবাত শ্বসনের ব্যবহার।
❖ শ্বসনের প্রভাবকসমূহ।
ব্যবহারিক :
০ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা।

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ : সক্রিয় শোষণ
পাঠ ২	উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ : নিষ্ক্রিয় শোষণ
পাঠ ৩	প্রস্বেদন
পাঠ ৪	পত্ররন্ধ্র
পাঠ ৫	পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল
পাঠ ৬	**ব্যবহারিক :** পত্ররন্ধ্রের গঠন পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিতকরণ
পাঠ ৭	সালোকসংশ্লেষণ
পাঠ ৮	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : আলোক পর্যায়
পাঠ ৯	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : অন্ধকার পর্যায়
পাঠ ১০	সালোকসংশ্লেষণে প্রভাবকসমূহের ভূমিকা
পাঠ ১১	**ব্যবহারিক :** সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্যাসের অপরিহার্যতা পরীক্ষা
পাঠ ১২	শ্বসন
পাঠ ১৩	সবাত শ্বসন : গ্লাইকোলাইসিস
পাঠ ১৪	পাইরুভিক অ্যাসিড সক্রিয়করণ ও ক্রেবস চক্র
পাঠ ১৫	ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)
পাঠ ১৬	অবাত শ্বসন
পাঠ ১৭	শিল্পে অবাত শ্বসনের ব্যবহার
পাঠ ১৮	শ্বসন হার, শ্বসনের প্রভাবকসমূহ ও গুরুত্ব
পাঠ ১৯	**ব্যবহারিক :** অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাসের নির্গমন পরীক্ষা

৯.১ : খনিজ লবণ পরিশোষণ (Absorption of Mineral Salts)

উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত দেহাভ্যন্তরে এগুলো তৈরি হয় না; বাইরে থেকে, বিশেষ করে মাটি থেকে এসব খনিজ লবণ শোষণ করে নিতে হয়। স্বাস্থ্যপ্রদ ও শারীরিক পরিপূর্ণতার জন্য এগুলো আবশ্যকীয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, উদ্ভিদের জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার (গন্ধক), লৌহ, ম্যাংগানিজ, তামা, দস্তা, মলিবডেনাম, বোরন, নিকেল ও ক্লোরিন—এ **১৭টি উপাদান** অত্যাবশ্যকীয়। এর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া সব কয়টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে।

লবণ পরিশোষণ অঙ্গ : স্থলজ উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলের নবগঠিত কোষগুলোই লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম। মূলরোম দিয়েও কিছু লবণ পরিশোষিত হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় যে, নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের সব অঙ্গই লবণ পরিশোষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কোন্ বা কি অবস্থায় লবণ পরিশোষিত হয়? উদ্ভিদ কখনো কঠিন অবস্থায় কোনো পদার্থ শোষণ করতে পারে না এবং এ বৈশিষ্ট্যে প্রাণী হতে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ পৃথক। মাটিই খনিজ লবণ সরবরাহের একমাত্র উৎস। খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ধনাত্মক আয়ন বা **ক্যাটায়ন** (+) ও ঋণাত্মক আয়ন বা **অ্যানায়ন** (–)-এ বিভক্ত থাকে এবং লবণগুলো উদ্ভিদ **আয়ন** হিসেবেই পরিশোষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। পানিতে দ্রবীভূত হলে এটি Na^+ (ক্যাটায়ন) ও Cl^- (অ্যানায়ন)-এ বিভক্ত হয় এবং Na^+ ও Cl^- আয়ন হিসেবেই মূল কর্তৃক শোষিত হয়। আয়ন দুটি সমভাবে অথবা অসমভাবে শোষিত হতে পারে। বিভিন্ন আয়ন শোষণের হার বিভিন্ন প্রকার। **K^+ ও NO_3^- আয়ন সবচেয়ে দ্রুতগতিতে শোষিত হয় এবং Ca^{2+} ও SO_4^{2-} আয়ন সবচেয়ে মন্থর বা ধীরগতিতে শোষিত হয় বলে মনে করা হয়।** সাধারণ ক্যাটায়নগুলো (+) হলো K^+, Mg^{++}, Ca^{++}, Mn^{++}, Fe^{+++}, Cu^{++}, Zn^{++}, Co^{++}, Na^+ এবং সাধারণ অ্যানায়নগুলো (–) হলো NO_3^-, PO_4^{3-}, BO_3^-, SO_4^{2-}, Cl^-।

লবণ পরিশোষণ কী? উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশের জন্য মাটি থেকে আয়ন হিসেবে খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াই হলো **লবণ পরিশোষণ**।

উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান

E. Epstein (1972) বলেন যে, নিম্নলিখিত দুটি কারণে (অথবা দুটির যেকোনোটি) একটি মৌলকে অত্যাবশ্যকীয় বলা যাবে; যথা— (১) এ মৌলটি ছাড়া উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারবে না, (২) মৌলটি উদ্ভিদ গঠনের বা মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয় অংশ (যেমন— ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য দরকারি, আর ক্লোরোফিল ফটোসিনথেসিস-এর জন্য দরকারি।)। ফসফরাসের অভাবে উদ্ভিদের পাতা ও ফুল ঝরে পড়ে।

যে মৌলগুলো অধিক পরিমাণে লাগে সেগুলো **ম্যাক্রোমৌল (১–৯)** ; যে মৌলগুলো অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে লাগে সেগুলো **মাইক্রোমৌল (১০–১৭)**; যে মৌল কোনো কোনো উদ্ভিদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, তাহলো **উপকারী মৌল;** যেমন— সিলিকন (ঘাসের জন্য), সোডিয়াম (C_4 উদ্ভিদের জন্য), কোবাল্ট (নাইট্রোজেন ফিকসিং লিগিউমের জন্য) ও আয়োডিন (সামুদ্রিক শৈবালের জন্য)। সিলিকন ঘাস উদ্ভিদের জন্য **ম্যাক্রোমৌল** (পরিমাণ-৩০)। কাজেই সে হিসেবে ম্যাক্রোমৌল ১০টি এবং মাইক্রোমৌল ৮টি বলা যায়।

নিচে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে উদ্ভিদ যেসব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে তা দেখানো হলো :

মৌলের নাম	ধাতু/অধাতু	রাসায়নিক সংকেত	গ্রহণীয় রূপ	শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol^{-}/kg)
ম্যাক্রোমৌল				
১. হাইড্রোজেন	অধাতু	H	H_2O	60,000
২. কার্বন	”	C	CO_2	40,000
৩. অক্সিজেন	”	O	O_2, CO_2, H_2O	30,000
৪. নাইট্রোজেন	”	N	NO_3^-, NH_4^+	1000

মৌলের নাম	ধাতু/অধাতু	রাসায়নিক সংকেত	গ্রহণীয় রূপ	শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol$^-$/kg)
ম্যাক্রোমৌল				
৫. পটাসিয়াম	ধাতু	K	K^+	250
৬.. ক্যালসিয়াম	”	Ca	Ca^{2+}	125
৭. ম্যাগনেসিয়াম	”	Mg	Mg^{2+}	80
৮. ফসফরাস	অধাতু	P	PO_4^{3-}	60
৯. সালফার (গন্ধক)	”	S	SO_4^{2-}	30
মৌলের নাম	**ধাতু/অধাতু**	**রাসায়নিক সংকেত**	**গ্রহণীয় রূপ**	**শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol$^-$/kg)**
মাইক্রোমৌল				
১০. ক্লোরিন	অধাতু	Cl	Cl^-	3.0
১১. বোরন	”	B	BO_3^-	2.0
১২. আয়রন (লৌহ)	ধাতু	Fe	Fe^{2+}, Fe^{3+}	2.0
১৩. ম্যাঙ্গানিজ	”	Mn	Mn^{2+}	1.0
১৪. জিঙ্ক (দস্তা)	”	Zn	Zn^{2+}	0.3
১৫. কপার (তামা)	”	Cu	Cu^{2+}	0.1
১৬. নিকেল	”	Ni	Ni^{2+}	0.05
১৭. মলিবডেনাম	”	Mo	Mo_4^{2-}	0.001

মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা (Availabity of Mineral Salts in Soil)

মাটিস্থ দ্রবণে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং ক্যাটায়নের কিছু পরিমাণ কলয়ডাল দানার গায়ে লেগে থাকতে (adsorbed) পারে। মনে করা হয় কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো আয়নসমূহ আয়ন একচেঞ্জ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য। আয়ন একচেঞ্জ-এর জন্য দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

মতবাদ দুটি নিম্নরূপ :

(i) **কার্বন ডাই-অক্সাইড একচেঞ্জ মতবাদ :** এ মতবাদ অনুযায়ী উদ্ভিদমূল শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে CO_2 সৃষ্টি করে তা মাটিস্থ পানির সাথে বিক্রিয়া করে **কার্বনিক অ্যাসিড** তৈরি করে। কার্বনিক অ্যাসিড পরে ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-)-এ পরিণত হয়। কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো ক্যাটায়ন (K^+)-এর সাথে H^+ এর স্থান পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে HCO_3^- আয়নের জন্যও অ্যানায়নের সাথে বিনিময় ঘটে। এর ফলে মূলের শোষণ অঙ্গের কাছে উভয় প্রকার আয়নই সহজলভ্য হয়।

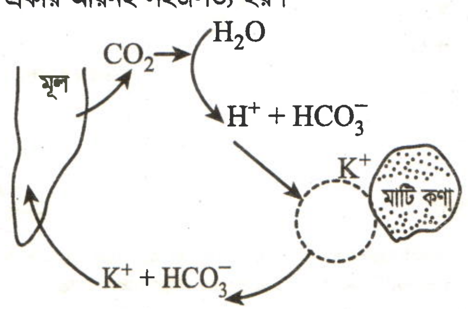

চিত্র ৯.১ : কার্বন ডাই-অক্সাইড একচেঞ্জ মতবাদের চিত্ররূপ

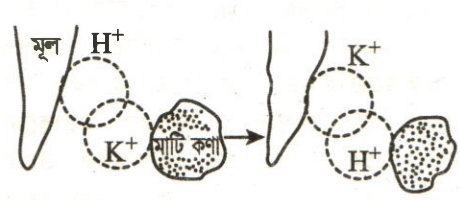

চিত্র ৯.২ : কনট্যাক্ট একচেঞ্জ মতবাদের চিত্ররূপ

(ii) **কনট্যাক্ট একচেঞ্জ মতবাদ :** এ মতবাদ অনুযায়ী কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো আয়ন স্থির অবস্থায় থাকে না এবং আয়নসমূহ কলয়ডাল দানার গায়ে স্বল্প জায়গায় কম্পিত হতে থাকে। মূলের গায়ের আয়নসমূহও একইভাবে কম্পিত হতে

থাকে। এভাবে দু' অবস্থানের আয়নসমূহের কম্পনের স্থান যদি সাধারণ অবস্থায় চলে আসে অর্থাৎ যুগপৎ ঘটে (overlap) তবেই ক্যাটায়ন একচেঞ্জ তথা এক ক্যাটায়নের সঙ্গে অন্য ক্যাটায়নের বিনিময় সংঘটিত হয়। (চিত্রে K^+ এর সাথে H^+) এভাবে মূলের জন্য আয়ন সহজলভ্য হয়।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া

উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ (N, Ca, P, K, Mg, Fe, S, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Cl, Ni প্রভৃতি) মাটি হতে আয়ন আকারে শোষণ করে নেয়। লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্যাটায়ন (+) অথবা অ্যানায়ন (–) হিসেবে অবস্থান করে; যেমন— NaCl লবণ দ্রবীভূত হয়ে Na^+ (ক্যাটায়ন) এবং Cl^- (অ্যানায়ন) হিসেবে অবস্থান করে। মাটিস্থ পানিতে অবস্থিত সাধারণ ক্যাটায়নগুলো (+) হলো K^+, Mg^{++}, Fe^{+++}, Mn^{++}, Cu^{++}, Zn^{++} এবং সাধারণ অ্যানায়নগুলো (–) হলো NO_3^-, PO_4^{---}, BO_3^-, SO_4^{--}, Cl^-।

লবণ পরিশোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অদ্যাবধি লবণ পরিশোষণ সম্বন্ধে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত লবণের ঘনত্ব মূলস্থ কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা অনেক কম। তবুও উদ্ভিদ ঘনত্বের আনতি (concentration gradient)-এর বিরুদ্ধে লবণ শোষণ করে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ হতে লবণ বের হয়ে যাওয়ার কথা। যা হোক, খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : **(১) সক্রিয় পরিশোষণ** এবং **(২) নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ**।

(১) সক্রিয় লবণ পরিশোষণ (Active Salt absorption) : মাটিস্থ দ্রবণে কোনো আয়নের ঘনত্ব মূলের শোষণ অঞ্চলের কোষরসে সেই আয়নের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলেও দেখা যায় মাটির দ্রবণ হতে ঐ আয়ন কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। **ঘনত্ব আনতির** (concentration gradient) **বিপরীতে এ শোষণ ঘটে বলে এতে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে।** বিপাকীয় কার্যাবলির কারণে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই এ জাতীয় পরিশোষণকে সক্রিয় পরিশোষণ বলে। অধিকাংশ খনিজ লবণ সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতিতেই মূল কর্তৃক পরিশোষিত হয়ে থাকে। সক্রিয় শোষণেরও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে; যেমন— সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ, প্রোটন-অ্যানায়ন কোট্রান্সপোর্ট মতবাদ, লেসিথিন মতবাদ ইত্যাদি। তবে প্রত্যেক মতবাদই আয়ন বাহক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সক্রিয় শোষণে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একই সাথে পরিশোষিত হতে পারে।

আয়ন বাহক ধারণা (The carrier concept of ion) : আয়ন বাহক ধারণার ওপর নির্ভরশীল তিনটি মতবাদ নিচে বর্ণনা করা হলো :

(i) লুনডেগড় মতবাদ (Lundegardth theory-1955) : এ মতবাদকে Cytochrome pump মতবাদও বলা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী বাহক হচ্ছে cytochrome (Cyt.)। লুনডেগড়ের মতানুযায়ী অ্যানায়ন পরিশোষণ প্রকৃতপক্ষে cytochrome system-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। লুনডেগড়-এর মতে কোষঝিল্লির ভেতরের তল-এ **ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে প্রোটন (H^+) এবং ইলেকট্রন (e^-) সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনটি সাইটোক্রোম চেইন-এর মাধ্যমে কোষঝিল্লির বাইরের দিকে চলে আসে এবং O_2 এর সাথে মিলে প্রোটন সহযোগে পানি তৈরি করে। এর ফলে কোষঝিল্লির বাইরের তলে সাইটোক্রোমের বিজারিত লৌহ (reduced iron) ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত (oxidised) হয় এবং একটি অ্যানায়ন গ্রহণ করে।

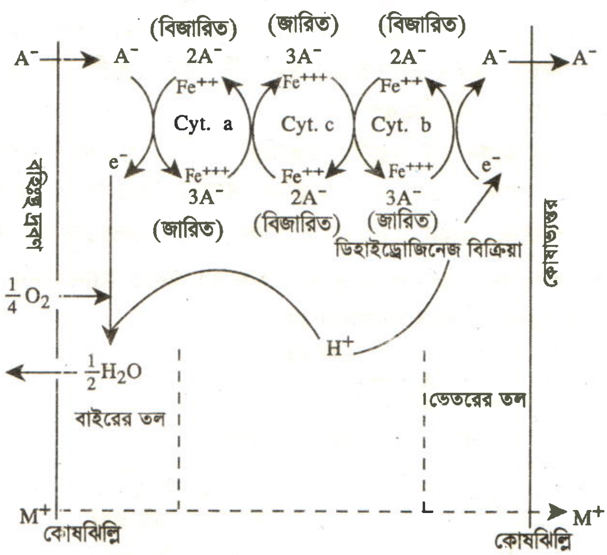

চিত্র ৯.৩ : সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ অনুযায়ী অ্যানায়ন (A^-) সক্রিয়ভাবে এবং ক্যাটায়ন (M^+) নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোধিত হচ্ছে।

প্রক্রিয়াটি এরূপ : $Fe^{++}(2A^-) - e^- + A^- \longrightarrow Fe^{+++}(3A^-)$

কোষঝিল্লির ভেতরের তলে (inner space) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ ডিহাইড্রোজিনেজ বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং কোষঝিল্লির বাইরের তলে (outer space) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ যে অ্যানায়ন (A^-) গ্রহণ করে তা বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভেতরের দিকে মুক্ত করে দেয়। এভাবে ভেতরের দিকে অ্যানায়ন (A^-) জমা হতে থাকে। কিন্তু ক্যাটায়ন (চিত্রে M^+) শোষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে বহিঃস্থ দ্রবণ থেকে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

(ii) প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ (Proton-Anion co-transport theory) : আধুনিক ধারণায়, কোষঝিল্লির উভয় দিকে একটি তড়িৎ রাসায়নিক নতিমাত্রা (electrochemical gradient) সৃষ্টির মাধ্যমে আয়নগুলো কোষের ভেতরে স্থানান্তরিত হয়।

এ আধুনিক মতবাদ অনুসারে, আয়ন নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রোটিন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভেতরের দ্রবণে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটিন নির্দিষ্ট আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে।

ধারণা করা হয় কোষঝিল্লির ভেতরের তলের দিকে ATP-ase এনজাইমের ক্রিয়ায় ATP ভেঙ্গে শক্তি নির্গত হয়। যার প্রভাবে প্রোটন (H^+) কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। একে **প্রোটন পাম্প** বলে।

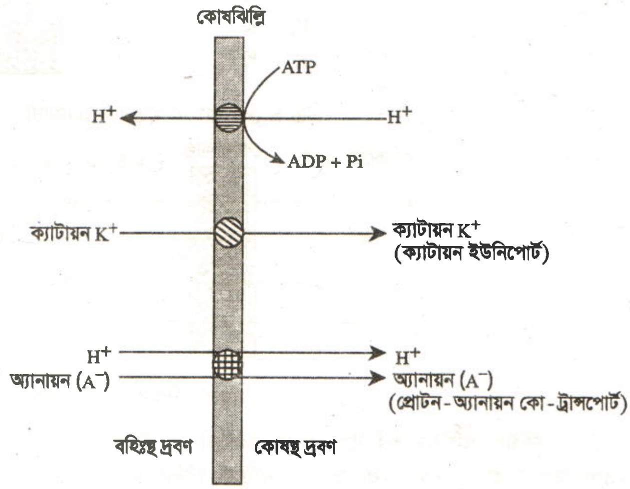

চিত্র ৯.৪ : প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট অনুযায়ী আয়ন শোষণ

প্রোটন পাম্পের কারণে কোষের বাইরের সাথে ভেতরের দিকে pH gradient (বাইরে pH কম) এবং potential gradient (কোষের বাইরের +ve চার্জ বেশি, কোষের ভেতরে +ve চার্জ কম) তৈরি হয় যাকে একত্রে Electrochemical potential gradient বা Proton motive force বলে।

কোষ পর্দার অভ্যন্তরে Proton motive force তৈরি হলেই বাহক প্রোটিনগুলো সক্রিয় হয় এবং ক্যাটায়নগুলোকে বহন করে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভেতরে নিয়ে আসে। প্রোটনও বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে চায়, আর সেসময় অ্যানায়নগুলো প্রোটনের সাথে (প্রোটন ও অ্যানায়ন একসঙ্গে) প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য একে **প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট** বলা হয়। এ ধারণাটি Peter Mitchel (1968) এর কেমি-অসমোটিক মডেলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

(iii) লেসিথিন বাহক ধারণা (Lacithin carrier concept) : Bennet Clark (1956) নামক বিজ্ঞানী মনে করেন, লেসিথিন নামক ফসফোলিপিড আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। লেসিথিন কোষঝিল্লির বাইরের তলে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন গ্রহণ করে একটি যৌগ তৈরি করে ভেতরের তলে নিয়ে যায়। যৌগটি ভেতরের তলে কোলিন-ফসফেটাইডিক অ্যাসিড এ ভেঙ্গে গিয়ে আয়ন দুটিকে মুক্ত করে। ATP প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়।

(২) নিষ্ক্রিয় লবণ পরিশোষণ (Passive Salt absorption) : যে পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় আয়ন শোষণের জন্য কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না সে পরিশোষণই হলো নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ। এতে শ্বসন হার স্বাভাবিক থাকে। নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ঘটে থাকে :

(i) ব্যাপন মতবাদ (Diffusion Theory) : মাটিতে অবস্থিত দ্রবণ হতে কোষের অভ্যন্তরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কিছু আয়ন প্রবেশ করে। উদ্ভিদের লবণ শোষণ অঞ্চলের কোষরসে কোনো আয়নের ঘনত্ব মাটির দ্রবণে অবস্থিত ঐ আয়নের ঘনত্ব হতে কম হলে আয়নটি মাটির দ্রবণ হতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষরসে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে আয়ন পরিশোষিত হতে থাকে। (Hope & Stevens, 1952)

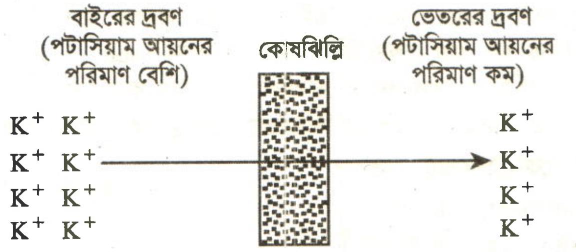

চিত্র ৯.৫ : ব্যাপন মতবাদ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে আয়ন শোষণ।

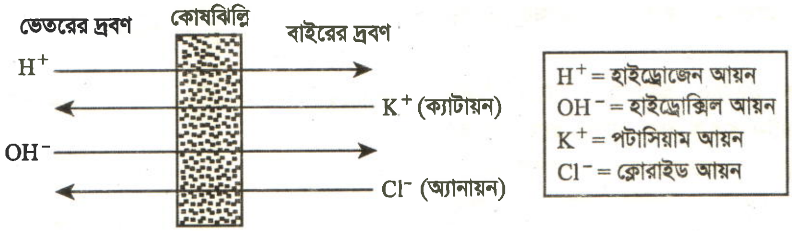

চিত্র ৯.৬ : আয়ন বিনিময় মতবাদ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে আয়ন শোষণ।

(ii) আয়ন বিনিময় মতবাদ (Ion exchange theory) : উদ্ভিদমূলের কোষরস হতে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন বাইরের দ্রবণে নির্গত হয়। তখন কোষের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বাইরের দ্রবণ হতে ক্যাটায়ন (K^+) কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একইভাবে হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নের বিনিময়ে অ্যানায়ন (Cl^-আয়ন) কোষরসে প্রবেশ করে। আয়ন এক্সচেঞ্জ বলতে আয়নের এরূপ বিনিময়কে বোঝানো হয়। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একসাথে পরিশোষিত হয় না। ডেভলিন (১৯৬৯) এ মতবাদের প্রবক্তা এবং পান্ডে ও সিনহা (১৯৭২) এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

(iii) ডোন্যান সাম্যাবস্থা মতবাদ (Donnan equilibrium theory) : কোষঝিল্লির অভ্যন্তরে অব্যাপনযোগ্য কিছু স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকলে, একে নিরপেক্ষ করার জন্য বাইর হতে কিছু ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট ক্যাটায়ন ঝিল্লির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্লাজমাঝিল্লির ভেতর এরূপ স্থির আয়নের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে বাইরে থেকে ভেতরে একটি সাম্যাবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্যাটায়নের ব্যাপন চলতে থাকে, একে ডোন্যান সাম্যাবস্থা বলে। বিজ্ঞানী F. G. Donnan (1911–1914) এ মতবাদের প্রবক্তা।

(iv) ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ (Mass flow theory) : অনেক বিজ্ঞানী [Hylmo (1955) ও Kramen (1956)] মনে করেন যে, প্রস্বেদন টানে যখন ব্যাপক হারে পানি পরিশোষিত হয় তখন পানির সাথে সাথে খনিজ লবণের আয়নও পরিশোষিত হয়।

বস্তুর কোষ মেমব্রেনের বাইলেয়ার পাড়ি দেয়ার কৌশল

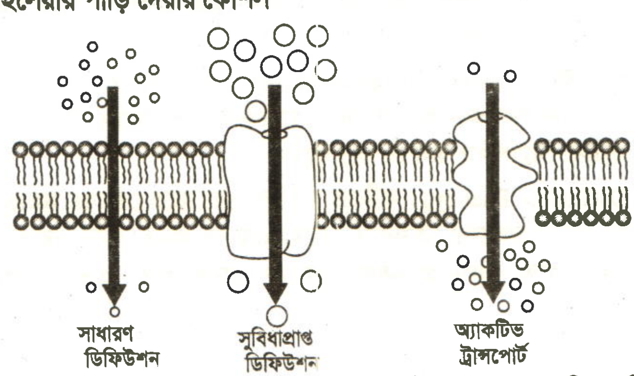

চিত্র ৯.৭ : সাধারণ ডিফিউশনের মাধ্যমে, সুবিধাপ্রাপ্ত (প্রোটিন চেনেলের মধ্যদিয়ে) ডিফিউশনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় ট্রান্সপোর্ট হয়। ATP থেকে শক্তি খরচের মাধ্যমে অ্যাকটিভ (সক্রিয়) ট্রান্সপোর্ট ঘটে।

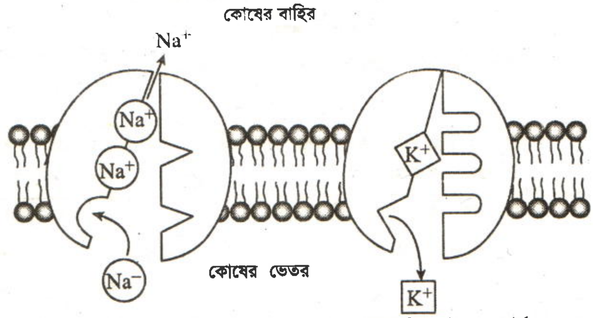

চিত্র ৯.৮ : সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্পের মাধ্যমে সক্রিয় ট্রান্সপোর্ট (Na^+ ভেতর থেকে বাইরে এবং K^+ বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ)।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সক্রিয় পরিশোষণ	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ
১। বিপাকীয় শক্তি	সক্রিয় পরিশোষণে বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে।	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।
২। শ্বসন হার	সক্রিয় পরিশোষণে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়।	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে শ্বসন হার স্বাভাবিক থাকে।
৩। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন শোষণ	ক্যাটায়ন (+) ও অ্যানায়ন (−) এর শোষণ একই সাথে সংঘটিত হয়।	ক্যাটায়ন (+) ও অ্যানায়ন (−) এর শোষণ একই সাথে সংঘটিত হয় না।
৪। আয়ন বাহক	সক্রিয় পরিশোষণ বাহক আয়ন বা অণু দ্বারা সম্পন্ন হয়।	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে কোনো বাহক আয়ন বা অণুর দরকার হয় না।
৫। এনজাইম বা উৎসেচক	সক্রিয় শোষণে এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।

খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ : আয়নের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, pH, আলোক, অক্সিজেন, শ্বসনিক বস্তু প্রভৃতি প্রভাবক দিয়ে খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবকগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে খনিজ লবণ পরিশোষণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

১। **আয়নের ঘনত্ব :** বহিঃস্থ দ্রবণে আয়নের ঘনত্ব শোষণ হারকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নের ঘনত্ব বাড়লে শোষণ হার বৃদ্ধি পায়।

২। **তাপমাত্রা :** একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাপমাত্রার বৃদ্ধি লবণ পরিশোষণ হার বৃদ্ধি করে। এ সীমা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা বা উচ্চতাপমাত্রা পরিশোষণ হার কমিয়ে আনে, এমনকি পরিশোষণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩। **আলো :** আলো পরোক্ষভাবে লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। পত্ররন্ধ্রের খোলা-বন্ধ হওয়া এবং প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে আলো লবণ পরিশোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রস্বেদনের হার বাড়লে মূল হতে পাতায় পানির পরিবহণ হার বাড়ে, ফলে লবণ পরিবহণও বাড়ে। মূল হতে অধিক লবণ পরিবাহিত হয়ে চলে যাওয়ায় পরবর্তীতে মূল অধিক পরিমাণ লবণ শোষণ করতে পারে।

৪। **প্রস্বেদন :** প্রস্বেদন প্রক্রিয়াও লবণ পরিশোষণে প্রভাব বিস্তার করে।

৫। **অক্সিজেন :** অক্সিজেনের অভাব হলে সক্রিয় লবণ পরিশোষণ হার কম হয়। অক্সিজেনের অভাব শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই লবণ পরিশোষণ হার কম হয়।

৬। **শ্বসনিক বস্তু :** শ্বসনিক বস্তু কম থাকলে শ্বসন হার কম হয়, আর তাই লবণ পরিশোষণ হারও কমে যায়।

৭। **আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়া :** একটি আয়ন শোষিত হলে সেখানে বিদ্যমান অন্য একটি আয়নের ওপর তার প্রভাব পড়ে। Ca, Mg আয়নের উপস্থিতি K আয়নের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৮। **বৃদ্ধি অঞ্চল :** সক্রিয় কোষ বিভাজন অঞ্চল ও বৃদ্ধি অঞ্চলে লবণ পরিশোষণ বেশি ঘটে।

পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পানি পরিশোষণ	খনিজ লবণ পরিশোষণ
১. শোষণের অবস্থা	অধিকাংশ পানি নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয়।	অধিকাংশ খনিজ লবণ সক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয়।
২. বিপাকীয় শক্তি	পানি পরিশোষণের জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে না।	খনিজ লবণ পরিশোষণের জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে।
৩. শোষণ	পানি অণু হিসেবে শোষিত হয়।	খনিজ লবণ আয়ন হিসেবে শোষিত হয়।
৪. শোষণের মাধ্যম	অধিকাংশ পানি মূলরোম অঞ্চল দিয়ে শোষিত হয়।	অধিকাংশ খনিজ লবণ মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল দিয়ে শোষিত হয়।
৫. বাহক	পানি পরিশোষণের জন্য কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না।	খনিজ লবণ পরিশোষণের জন্য বাহকের প্রয়োজন হয়।

৯.২ : প্রস্বেদন (Transpiration)

উদ্ভিদ অব্যাহতভাবে তার মূলরোম দিয়ে পানি শোষণ করে এবং সে পানি পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়। উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত পানির সামান্য অংশই তার বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় খরচ হয় এবং বেশির ভাগই (শতকরা ৯৯ ভাগ পর্যন্ত) বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়।

যে শারীরতাত্ত্বিক (physiological) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ (সাধারণত পাতা) **হতে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়, তাকে প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন বলে।** বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত উদ্ভিদের যেকোনো অংশে প্রস্বেদন সংঘটিত হয়। তবে পাতাই উদ্ভিদের প্রধান প্রস্বেদন অঙ্গ। গড় হিসেবে শোষিত পানির মাত্র ১% দেহে অবস্থান করে ও কাজে লাগে, বাকি ৯৯% পানি দেহ থেকে বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। এটি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া, তবে অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিকরও হতে পারে। বিজ্ঞানী **কার্টিস** (Curtis) প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় অমঙ্গল' (necessary evil) বলেছেন। **গ্যানং পটোমিটার**-এর সাহায্যে প্রস্বেদন হার নির্ণয় করা যায়।

DAT 21-22

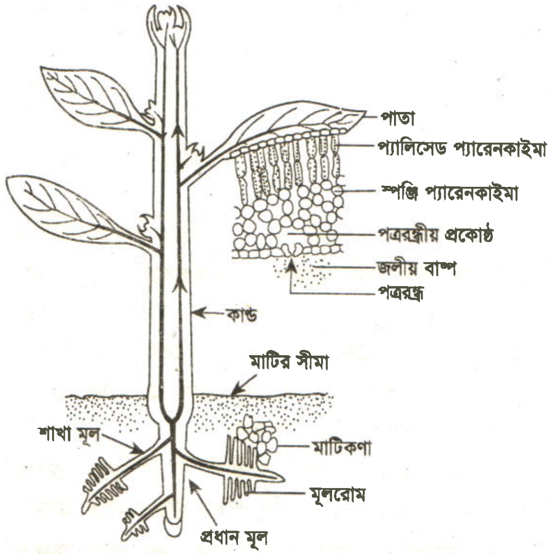

চিত্র ৯.৯ : উদ্ভিদে মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ এবং পাতা কর্তৃক প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে নির্গমন।

প্রস্বেদনের প্রকারভেদ : যে পথে পানি বাষ্পাকারে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর হতে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে সে পথের ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে প্রস্বেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

(১) **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন** (Stomatal transpiration) : পত্ররন্ধ্রের মধ্যদিয়ে প্রস্বেদন;

(২) **ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন** (Cuticular transpiration) : পত্রত্বকের কিউটিকলের মধ্যদিয়ে প্রস্বেদন;

(৩) **লেন্টিকুলার প্রস্বেদন** (Lenticular transpiration) : কাণ্ডের লেন্টিসেলের মধ্যদিয়ে প্রস্বেদন। লেন্টিসেল হলো উদ্ভিদকাণ্ডে গৌণ বৃদ্ধির ফলে ভেতরের চাপে কর্ক টিস্যু স্থানে স্থানে ফেটে সৃষ্ট ছিদ্রপথ।

(১) **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন:** পানি বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্র পথে বেরিয়ে বাতাসের সাথে মিশে যাওয়াকে **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন** বলে। পাতায় এবং কচি কাণ্ডে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকে (ফুলের বৃতি, পাপড়িতেও পত্ররন্ধ্র থাকে)। শতকরা ৯৫–৯৮ ভাগ প্রস্বেদন এ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। কাজেই **পাতাই প্রস্বেদনের প্রধান অঙ্গ**।

(২) ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন : উদ্ভিদদেহকে শুষ্কতার হাত হতে রক্ষার জন্য বহিঃত্বকের ওপর যে কিউটিন জাতীয় অভেদ্য রাসায়নিক পদার্থের আস্তর থাকে তাকে **কিউটিকল** বলে। **কিউটিন হলো একটি স্নেহজাতীয় পদার্থ।** বিশেষত পাতার উভয় পাশের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে। যেসব উদ্ভিদ আর্দ্র, ছায়াময় পরিবেশে জন্মে তাদের কিউটিকল বেশ পাতলা থাকে। এ ধরনের উদ্ভিদের ত্বকীয় প্রস্বেদনের হার বেশি হয়। কিউটিকল পাতলা হলে কিউটিকল ভেদ করেও কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় অর্থাৎ প্রস্বেদন হয়। **পত্রত্বকের কিউটিকল ভেদ করে সংঘটিত প্রস্বেদনকে ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন** বলে। যদিও পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক কম। তথাপি অত্যধিক শুষ্কাবস্থায় যখন পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় (এবং এর ফলে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বন্ধ হয়ে পড়ে) তখনও ত্বকীয় প্রস্বেদন চলতে পারে। শতকরা ২–৫% প্রস্বেদন এ প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে।

এমতাবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। মরুজ উদ্ভিদের কিউটিকল বেশ পুরু থাকে বলে এদের ত্বকীয় প্রস্বেদন অত্যন্ত কম হয়।

(৩) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন : উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় কাণ্ডের কর্ক টিস্যুর স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে লেন্টিসেল (lenticel)-এর সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেল দিয়ে কিছু কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। **পানি যখন বাষ্পাকারে লেন্টিসেল পথে বেরিয়ে যায়, তখন তাকে লেন্টিকুলার** প্রস্বেদন বলে। খুব কম পরিমাণ পানিই এ পথে বের হয়। লেন্টিসেল পেরিডার্ম স্তরে অবস্থান করে এবং সব সময় খোলা থাকে। এজন্য দিবা-রাত্রি সমভাবে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন চলতে থাকে। উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ পানি হারায় তার প্রায় ১% লেন্টিকুলার প্রস্বেদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন ও ত্বকীয় (কিউটিকুলার) প্রস্বেদন এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন	ত্বকীয় (কিউটিকুলার) প্রস্বেদন
১। মাধ্যম	প্রস্বেদন পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে ঘটে।	প্রস্বেদন কিউটিকলের মাধ্যমে ঘটে।
২। কখন ঘটে	পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকলে প্রস্বেদন বন্ধ থাকে।	পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকলেও প্রস্বেদন চলতে পারে।
৩। প্রস্বেদনের হার	প্রস্বেদনের হার অনেক বেশি, ৯৫–৯৮%।	প্রস্বেদনের হার খুবই কম, ২–৫% বা আরো কম।
৪। রক্ষীকোষের নিয়ন্ত্রণ	এ ধরনের প্রস্বেদন রক্ষীকোষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	এতে রক্ষীকোষের কোনো ভূমিকা নেই।

পত্ররন্ধ্র বা স্টোম্যাটা (Stomata)

পাতার (এবং কচি কাণ্ডের) উর্ধ্ব ও নিম্নতলের বহিঃত্বকে (এপিডার্মিসে) অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম রন্ধ্রকে **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোম্যাটা** (stomata, একবচনে stoma) বলে। পত্ররন্ধ্র শুধু বিশেষ আকৃতির ছিদ্র নয়, এটি উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রাঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমে কয়েকটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়াতেও এর ভূমিকা আছে। এর সাথে পত্ররন্ধ্র খোলা বা বন্ধ হওয়ার বিষয়টিও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে পাতার প্রতি এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় ১,০০০ হতে ৬০,০০০ পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে।

পত্ররন্ধ্রের গঠন : পত্ররন্ধ্র পাতার উপরিতলে অবস্থিত দুটি **অর্ধচন্দ্রাকৃতির রক্ষীকোষ** এবং এদের দিয়ে বেষ্টিত রন্ধ্র নিয়ে গঠিত। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষে একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, বহু ক্লোরোপ্লাস্ট ও ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে। রক্ষীকোষে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এটি খাদ্য তৈরি করে। রক্ষীকোষের চারদিকে অবস্থিত সাধারণ ত্বকীয় কোষ হতে একটু ভিন্ন আকার-আকৃতির ত্বকীয় সহকারী কোষ থাকে। স্টোম্যাটার নিচে একটি বড়ো বায়ুকুঠুরী থাকে।

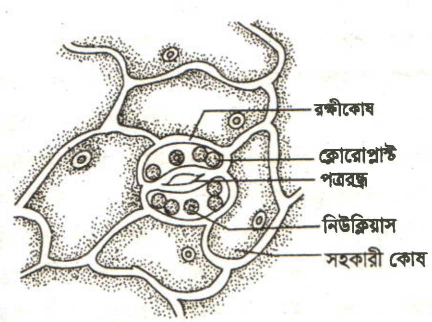

চিত্র ৯.১০ : একটি পত্ররন্ধ্রের গঠন।

অধিকাংশ উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র সকাল ১০–১১টা এবং বিকাল ২–৩টায় পূর্ণ খোলা থাকে, অন্যান্য সময় আংশিক খোলা থাকে এবং রাত্রিতে বন্ধ থাকে। (ব্যতিক্রম পাথরকুচি)।

পত্ররন্ধ্রের কাজ : উদ্ভিদের প্রধান তিনটি শারীরবৃত্তীয় কাজে (প্রস্বেদন, সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন) পত্ররন্ধ্র অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন—

(i) পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন চলাকালীন সময়ে উদ্ভিদ অঙ্গ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে **গ্যাসীয় বিনিময়** ঘটে (O_2 ও CO_2 ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে)।

(ii) উদ্ভিদদেহ থেকে অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বের করে দেয়া পত্ররন্ধ্রের প্রধান কাজ। এতে পরিবেশ শীতল থাকে। অতি তাপের ক্ষতি থেকে উদ্ভিদাঙ্গ রক্ষা পায়।

(iii) পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

(iv) প্রস্বেদনের সময় পানি জলীয় বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্রের মধ্যদিয়ে নির্গত হয়।

(v) লুক্কায়িত পত্ররন্ধ্র প্রস্বেদনের হার হ্রাস করে।

স্ট্রোমা ও স্টোম্যাটার মধ্যে পার্থক্য

স্ট্রোমা	স্টোম্যাটা
১. ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সমসত্ত্ব ধাত্রকে **স্ট্রোমা** বলে। স্ট্রোমা একটি কলয়েডধর্মী দ্রবণ।	১. উদ্ভিদের পাতার ত্বকে যে রন্ধ্র বা ছিদ্র থাকে তাকে **স্টোম্যাটা** বলে।
২. স্ট্রোমাতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন দানা, এনজাইম, স্টার্চদানা, লৌহ, রাইবোসোম, প্রোটিন যৌগ, DNA তন্তু, RNA, ভিটামিন প্রভৃতি থাকে।	২. স্টোম্যাটা একটি স্টোম্যাটাল-রন্ধ্র বা ছিদ্র ও দুটি রক্ষীকোষ নিয়ে গঠিত।
৩. সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার বিক্রিয়া স্ট্রোমায় ঘটে।	৩. অন্তঃটিস্যু ও পরিবেশের বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় স্টোম্যাটা দিয়ে চলে।

পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল (Mechanism of stomatal opening and closing) : পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের সবচেয়ে উপযোগী অঙ্গ হলো পত্ররন্ধ্র। রক্ষীকোষদ্বয়ের পত্ররন্ধ্র সংলগ্ন প্রাচীর বেশ পুরু কিন্তু বহির্ভাগের অর্থাৎ বহিঃত্বক-কোষসংলগ্ন প্রাচীর বেশ পাতলা হয় এবং এদের মধ্যে একটি করে বড়ো নিউক্লিয়াস এবং কিছু ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পাতায় অবস্থিত পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার নিয়ন্ত্রক কোষই হলো রক্ষীকোষ। **রক্ষীকোষদ্বয়ের স্ফীতি (turgid) অথবা শিথিল অবস্থা পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে**। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কারণে রক্ষীকোষে অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে থাকে। **রক্ষীকোষদ্বয় পার্শ্বস্থ বহিঃত্বক কোষ হতে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয় এবং এর ফলে রন্ধ্রসংলগ্ন পার্শ্বপ্রাচীর পুরু হওয়ায় এবং সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত থাকায় উল্টোদিকে বেঁকে যায় এবং রন্ধ্র খুলে যায়। অপরপক্ষে বহিঃঅভিস্রবণের ফলে রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়**। কাজেই দেখা যায়, পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া রক্ষীকোষদ্বয়ের গঠন এবং তার স্ফীত হওয়া ও শিথিল হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। রক্ষীকোষের স্ফীতি অবস্থা কতগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রভাবকগুলো- আলো, তাপমাত্রা ও জলীয় বাষ্প। রক্ষীকোষের স্ফীতি ও শিথিল অবস্থা সৃষ্টির জন্য এগুলোর মধ্যে আলোই প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কীভাবে রক্ষীকোষের স্ফীতি ও শিথিল অবস্থার সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। **পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছে।**

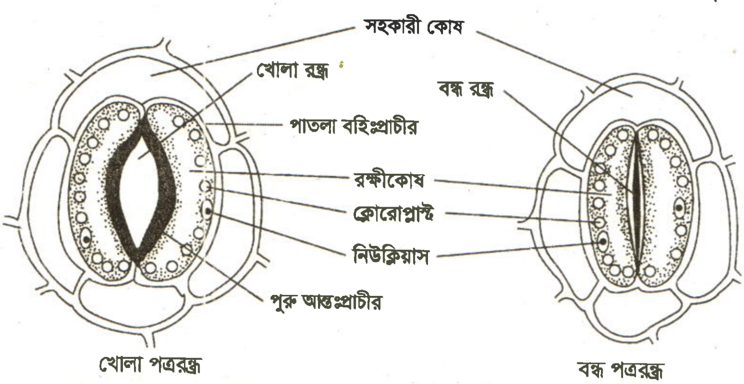

চিত্র ৯.১১ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল।

(i) বিজ্ঞানী **H. Von Mohl এর মতবাদ :** এই বিজ্ঞানী ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে রক্ষীকোষের স্ফীতির পরিবর্তনই পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ।

(ii) বিজ্ঞানী **লয়েড (F. E. Loyd) এর স্টার্চ-শ্যুগার মতবাদ :** লয়েড ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে, রক্ষীকোষের স্ফীতির পরিবর্তন স্টার্চ-শ্যুগার পারস্পরিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। এ ধারণা পরবর্তীতে **স্টার্চ-শ্যুগার মতবাদ** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্টার্চ (শ্বেতসার) অদ্রবণীয় হওয়ায় এর উপস্থিতিতে রক্ষীকোষদ্বয়ের অভিস্রবণিক চাপ কমে যায়, ফলে কোষস্থ পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং কোষ শিথিল হয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে যখন অদ্রবণীয় স্টার্চ (শ্বেতসার) হতে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় চিনি তৈরি হয় তখন অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী কোষ হতে অন্তঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং রক্ষীকোষ দুটি স্ফীত হয়, ফলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। পেছনের কারণ যা-ই হোক অন্তঃ ও বহিঃ অভিস্রবণ ঘটাই মুখ্য কারণ। [MAT-14-15]

কোনো কোনো প্রজাতির উদ্ভিদের রক্ষীকোষে কোনো ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, অথচ পত্ররন্ধ্র পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম থাকে। কাজেই পত্ররন্ধ্র খোলাতে স্টার্চ-এর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়।

(iii) বিজ্ঞানী **স্যায়েরি** (Sayre, 1926) **এর মতবাদ :** শ্বেতসার ও চিনির আন্তঃপরিবর্তন কোষ রসের pH এর জন্য ঘটে থাকে। রাত্রিতে সূর্যালোক না থাকায় সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু শ্বসন চলতে থাকে। শ্বসনের ফলে সৃষ্ট CO_2 রক্ষীকোষের কোষরসে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে, তাই pH কমে যায় (pH_5)। কোষরসের pH কম হলে কোষস্থ দ্রবণীয় চিনি অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত হয়। রক্ষীকোষে অদ্রবণীয় শ্বেতসার জমা হলে পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে, তাই রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়; ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

দিনের বেলায় সূর্যালোকের কারণে আবার সালোকসংশ্লেষণ শুরু হয়, ফলে কোষরসে দ্রবীভূত CO_2 ব্যবহৃত হয়ে যায় এবং pH বেড়ে যায় (pH_7)। কোষরসস্থ pH বেড়ে গেলে অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে পুনরায় দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত করে। ফলে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পার্শ্ববর্তী কোষ হতে পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। তাই রক্ষীকোষ স্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। [pH]

$$\text{অদ্রবণীয় শ্বেতসার} + \text{অজৈব ফসফেট} \underset{\text{অন্ধকার}, pH_5}{\overset{\text{ফসফোরাইলেজ, আলো}, pH_7}{\rightleftharpoons}} \text{দ্রবণীয় চিনি (গ্লুকোজ ১-ফসফেট)}$$

প্রোটন প্রবাহ মতবাদ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত স্টার্চ-শ্যুগার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(iv) **আধুনিক মতবাদ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ (Proton transport theory) [পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া] :**

S. Imamura ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রক্ষীকোষে পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ প্রমাণ করেন। পরবর্তী বহু গবেষণায় রক্ষীকোষে পটাসিয়াম আয়নের প্রবেশকে রক্ষীকোষের স্ফীতির মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

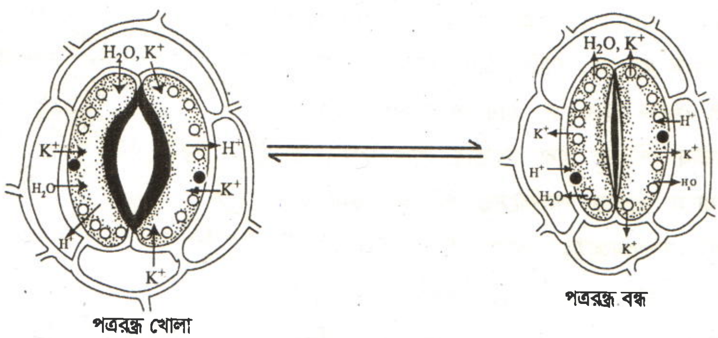

চিত্র ৯.১২ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধে K^+ প্রোটন প্রবাহ মতবাদ।

পত্ররন্ধ্র খোলা (আলোতে) : আলোক **বর্ণালির নীল অংশ** (Blue light)] রক্ষীকোষের রিসেপ্টর (সেন্সর) গুলোকে উদ্দীপ্ত করে, যার ফলে সক্রিয়ভাবে পটাসিয়াম আয়ন (K^+) রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। K^+ প্রবেশের কারণে কোষস্থ দ্রবণে দ্রব্যের (solute) ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ পানির পরিমাণ কমে যায়) এবং পার্শ্ববর্তী কোষ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। রক্ষীকোষে পানি প্রবেশের ফলে রক্ষীকোষ স্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। নীল আলো পত্ররন্ধ্র খোলা ত্বরান্বিত করে। [MAT-21-22]

- কোষে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে (সালোকসংশ্লেষণের ফলে এমন হয়) রক্ষীকোষে K^+ প্রবেশ বৃদ্ধি পায়, ফলে পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে এবং রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

- রক্ষীকোষ থেকে সক্রিয়ভাবে H^+ বের হয়ে গেলেও পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া (অন্ধকারে) : আলোর অভাবে বা অন্য কোনো কারণে রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের হয়ে যায়, সাথে সাথে পানিও বের হয়ে যায়। ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

- মেসোফিল কোষে পানির অভাব দেখা দিলে সেখানে **অ্যাবসিসিক অ্যাসিড** তৈরি হয়। যার ফলে রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের হয়ে যায়। K^+ বের হয়ে গেলে পানিও বের হয়ে যায়, ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।
- উচ্চতাপমাত্রায় ফটোসিনথেসিস কমে যায় এবং কোষীয় শ্বসন বেড়ে যায়। এর ফলে কোষে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরিণামে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই মনে করা হয় পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য একাধিক নিয়ামক কাজ করে।

রক্ষীকোষে পানি প্রবেশের কারণ :

অভিস্রবণিকভাবে কর্মক্ষম দ্রব (osmotically active solute), যার কারণে রক্ষীকোষে পানি প্রবেশ করে, তা বিভিন্ন উৎস থেকে আসে, যেমন—

(i) নীল আলোর কারণে K^+ ও Cl^- প্রবেশ ও সেখানে তৈরি ম্যালেট (malate 2^-)

(ii) স্টার্চ হাইড্রোলাইসিস হয়ে সৃষ্ট সুকরোজ।

(iii) ফটোসিনথেসিসের ফলে সৃষ্ট সুকরোজ।

(iv) মেসোফিল কোষ থেকে অ্যাপোপ্লাস্টিক (Apoplastic) উপায়ে প্রবেশকৃত সুকরোজ।

দেখা যায় সকালে পত্ররন্ধ্র খোলার সূচনা করে K^+, এরপর কোষে ক্রমেই সুকরোজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এক সময় সুকরোজই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় প্রথমে K^+, পরে সুকরোজ এবং শেষে পানি বের হয়ে যায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া : পত্ররন্ধ্রগুলো প্রস্বেদনের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। এগুলো দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাত্রে বন্ধ থাকে। পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে যে প্রস্বেদন হয় তাকে **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন** বলে। একটি উদ্ভিদে সংঘটিত প্রস্বেদনের শতকরা প্রায় ৯৫–৯৮ ভাগই পত্ররন্ধ্রীয় প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। পত্ররন্ধ্র খোলা থাকা অবস্থায় প্রস্বেদন কার্য সম্পন্ন হয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রস্বেদন হয় না। মাটি থেকে শোষণকৃত পানি মূল থেকে কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা হয়ে পাতায় পৌঁছায় এবং পাতার শিরা-উপশিরার মাধ্যমে পাতাস্থ **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** ও **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা** কোষে পৌঁছায়। উক্ত পানি শোষণ করে পাতার প্যারেনকাইমা কোষগুলো সম্পৃক্ত (saturated) হয় এবং ঐ পানির অধিকাংশই পাতার অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃস্থ তাপ, চাপ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাষ্পে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প তখন পাতার টিস্যুর আন্তঃকোষীয় ফাঁকে এবং পত্ররন্ধ্রসমূহের নিচে অবস্থিত পত্ররন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠে (গহ্বরে) জমা হয়। রক্ষীকোষের স্ফীতির কারণে পত্ররন্ধ্র খুলে গেলে সঞ্চিত বাষ্প ঐ রন্ধ্রপথে **ব্যাপন প্রক্রিয়ায়** বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকলে ব্যাপন প্রক্রিয়া দ্রুত হয়।

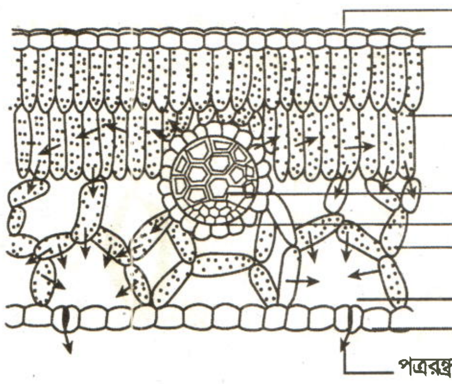

চিত্র ৯.১৩ : পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন।

প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহ : প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ।

বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ নিম্নরূপ :

১। **আলো :** প্রখর সূর্যালোক স্বাভাবিকভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এবং যার ফলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। আলোকের উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং আলোর অনুপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়; আর পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার ওপরই বেশির ভাগ প্রস্বেদন নির্ভরশীল। এ সমস্ত কারণেই প্রস্বেদনের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আলোর গুরুত্ব শীর্ষস্থানীয়। **ব্লু লাইট (নীল আলো) পত্ররন্ধ্র খোলা ত্বরান্বিত করে।** [MAT 21-22]

২। **তাপমাত্রা :** তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে প্রস্বেদন হারেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কারণ তাপ বাড়লে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়, ফলে বায়ু অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প শোষণ করতে পারে। অপরদিকে তাপ বাড়লে পানিও দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং প্রস্বেদনের হারকে ত্বরান্বিত করে। তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে পত্ররন্ধ্রের আয়তনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং তাপ বিভিন্ন দিক হতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

[MAT 21-22]

৩। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা :** আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পেলে অর্থাৎ কম হলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে গেলে বায়ু কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

৪। **বায়ুপ্রবাহ :** উদ্ভিদের প্রস্বেদন অঙ্গের আশপাশের বায়ু সাধারণত বেশি আর্দ্র থাকে। কারণ এ অঞ্চল কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প সরাসরি গ্রহণ করে সম্পৃক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রস্বেদনের হারের হ্রাস ঘটে। প্রবাহিত বায়ু পাতার নিকট হতে অধিক আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত করে নিয়ে যায়, ফলে স্থানটি কম আর্দ্র বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। কম আর্দ্র বায়ু কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প অধিকমাত্রায় গ্রহণ করে প্রস্বেদনের হারকে বাড়িয়ে দেয়।

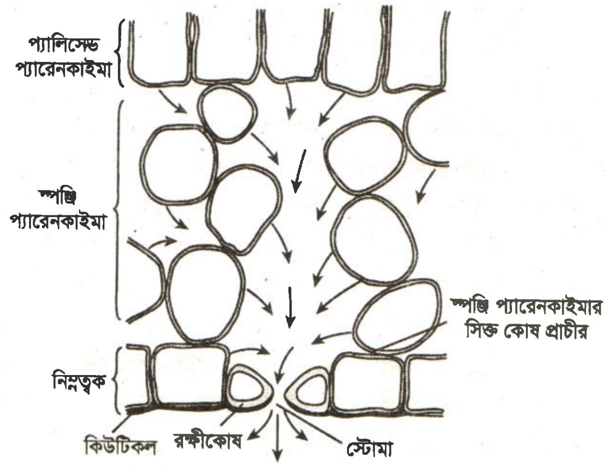

চিত্র ৯.১৪ : কোষ প্রাচীর থেকে পানি ইভাপোরেশন এবং স্টোমার মধ্যদিয়ে জলীয়বাষ্পের ব্যাপন।

৫। **আবহমণ্ডলের চাপ :** আবহমণ্ডলে চাপ কমার কারণে কম তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয় ফলে চাপ কমলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে চাপ বাড়লে প্রস্বেদনের হার কমে যায়।

৬। **মাটিস্থ পানি :** মাটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকলে উদ্ভিদ মাটি হতে অধিকমাত্রায় পানি গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়। অপরদিকে মাটিতে পানির প্রাপ্যতা কমে গেলে প্রস্বেদনের হারও ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ : অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ নিম্নরূপ :

১। **মূল-বিটপ অনুপাত :** আনুপাতিক হারে মূলের পরিমাণ কম হলে উদ্ভিদের জন্য মাটি হতে পানির প্রাপ্যতাও কমে যায় এবং প্রস্বেদনের হারও কমে যায় অর্থাৎ প্রস্বেদন অঞ্চল অপেক্ষা শোষণ অঞ্চল কম হলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

২। **পাতার আয়তন ও সংখ্যা :** পাতার আয়তন ও সংখ্যার তারতম্যে প্রস্বেদনের তারতম্য হয়। পাতার আয়তন ও সংখ্যা যত বেশি হবে প্রস্বেদনও তত বেশি হবে।

৩। **পাতার গঠন :** পাতার গঠনের ওপর প্রস্বেদনের হার নির্ভরশীল। পাতায় পাতলা কিউটিকল, পাতলা কোষ প্রাচীর, অধিক স্পঞ্জি টিস্যু ও উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্র থাকলে প্রস্বেদন তুলনামূলকভাবে বেশি হয় কিন্তু পুরু কিউটিকল, অধিক প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং পত্ররন্ধ্র গর্তস্থিত থাকলে প্রস্বেদনের হার কমে যায়। পাতার গায়ে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, রন্ধ্রের পরিমাণ, রক্ষীকোষের গঠন প্রভৃতি প্রস্বেদনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪। **মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ** : পাতার মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ বেশি হলে প্রস্বেদন হার বাড়ে। পক্ষান্তরে, মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ কমলে প্রস্বেদন হার কম হয়।

৫। **জীবনীশক্তি (Vigour)** : প্রস্বেদনের হার উদ্ভিদের জীবনীশক্তির ওপরও নির্ভর করে। সুস্থ-সবল উদ্ভিদে রোগাক্রান্ত দুর্বল উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রস্বেদন বেশি হয়।

প্রস্বেদনের অপকারিতা ও উপকারিতা : প্রস্বেদন উদ্ভিদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ক্ষতিকরও বটে। অবশ্য ক্ষতির তুলনায় উদ্ভিদ লাভবানই হয় বেশি। নিচে এদের বর্ণনা করা হলো :

প্রস্বেদনের অপকারিতা বা নেতিবাচক প্রভাব : মাটিতে পানির অভাব দেখা দিলেই প্রস্বেদন উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মাটিতে পানির অভাবের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক উদ্ভিদ মাটি হতে যে পরিমাণ পানি শোষণ করে তার অধিক পরিমাণ পানি প্রস্বেদনে বের হয়ে গেলে তার অন্তঃচাপ কমে যায়; ফলে গাছটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে (উইলটিং)। কয়েকদিনের জন্য এ অবস্থা চলতে থাকলে গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। প্রস্বেদনের কারণে উদ্ভিদের শোষিত পানির কিছুটা অপচয় হয়।

প্রস্বেদনের উপকারিতা বা উদ্ভিদের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন বা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তার বিশেষ কারণগুলো নিচে দেয়া হলো :

১। **পানি শোষণ :** পাতায় প্রস্বেদনের ফলে বাহিকা নালিতে পানির যে টান পড়ে সেই টান মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে থাকে। তাই জীবন রক্ষাকারী পানি শোষণে প্রস্বেদনের ভূমিকা আছে।

২। **পানি ও খাদ্যরস ওপরে ওঠানো :** পাতা ও অন্যান্য অংশে পানি ও খাদ্যরস পৌছানো অপরিহার্য। প্রস্বেদনের ফলে বাহিকা নালিতে পানির যে টান পড়ে তা সরাসরি পানিকে জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে মূল হতে কাণ্ড হয়ে পাতা পর্যন্ত পৌছাতে সহায়তা করে। এ পানির সাথে মূল কর্তৃক শোষিত খনিজ পদার্থ তথা সামগ্রিকভাবে খাদ্যরস ওপরে উত্থিত হয়।

৩। **লবণ পরিশোষণ :** প্রস্বেদনের কারণে চারদিক থেকে লবণ উদ্ভিদমূলের কাছাকাছি আসে, তাই উদ্ভিদ সহজে লবণ পরিশোষণ করতে পারে।

৪। **পাতা ও অন্যান্য অংশে খনিজ লবণ পৌছানো :** মূল কর্তৃক মাটি হতে যে লবণ শোষিত হয় তা স্বাভাবিকভাবে উঁচু গাছের পাতা পর্যন্ত পৌছাতে কয়েক বছর লাগার কথা। পাতার প্রতিটি ক্লোরোফিল অণু তৈরি হতে Mg এর দরকার যা অতিদ্রুত মূল হতে পাতা পর্যন্ত পৌছে থাকে কেবল প্রস্বেদনের কারণেই। কাজেই প্রস্বেদন না হলে পাতার ক্লোরোফিল সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেতো, ফলে খাদ্য তৈরিই বন্ধ হয়ে যেতো।

৫। **সকল কোষে পানি সরবরাহ :** প্রতিটি জীবিত কোষেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এর জন্য পানির প্রয়োজন। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার কারণে পানি সহজে সকল কোষে পৌছাতে পারে।

৬। **সালোকসংশ্লেষণ :** সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরির জন্য পানির প্রয়োজন ($6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$)। প্রস্বেদন না হলে এ বিপুল পরিমাণ পানি পাওয়া যেতো না, ফলে সালোকসংশ্লেষণ তথা খাদ্য তৈরি কমে যেতো, এমনকি বন্ধ হয়ে যেতো।

৭। **পাতায় উপযুক্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ :** বিভিন্ন কাজের জন্য পাতায় একটি উপযুক্ত তাপমাত্রার দরকার। প্রস্বেদন গাছকে অত্যধিক গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা রক্ষা করে।

৮। **কোষ বিভাজন :** কোষ বিভাজনের জন্য কোষের স্ফীতি অবস্থার প্রয়োজন। প্রস্বেদন পরোক্ষভাবে এ স্ফীতি অবস্থা এবং আরো পরোক্ষভাবে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

৯। **দৈহিক বৃদ্ধি :** কোষ বিভাজন, স্বাভাবিক স্ফীতি রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্বেদন গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

১০। **শক্তি নির্গমন :** পাতা সূর্য হতে প্রতি মিনিটে প্রচুর শক্তি শোষণ করে। এর মাত্র শতকরা একভাগ বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য খরচ হয়, বাকি অধিকাংশ তাপশক্তি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। নতুবা গাছ অধিক তাপে মরে যেতো।

১১। **অভিস্রবণ প্রক্রিয়া :** প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বাড়ে, ফলে সহজে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটে।

১২। পাতায় ছত্রাক আক্রমণ রোধ : প্রস্বেদনের ফলে পাতার পৃষ্ঠে কিছু পানিগ্রাহী লবণ জমা হয়, যা ছত্রাক আক্রমণ হতে পাতাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

১৩। খাদ্য পরিবহণ : প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিবহণ অব্যাহত থাকে।

১৪। পুষ্প পরিস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি : প্রস্বেদনের ফলে কোষে পরম রসস্ফীতি রক্ষা পায় বলে পুষ্প প্রস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি সম্ভব হয়।

১৫। বৃষ্টিপাত : প্রস্বেদনের ফলে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে গিয়ে আকাশে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। যে এলাকায় গাছপালা বেশি থাকে সে এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	প্রস্বেদন	বাষ্পীভবন
১. প্রক্রিয়া	এটি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।	এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া।
২. চাপের উদ্ভব	এতে নানা ধরনের চাপের উদ্ভব ঘটে।	এতে কোনো ধরনের চাপের উদ্ভব ঘটে না।
৩. পাতা	এতে পাতার তলে (Surface) আর্দ্রতা দেখা যায়।	এতে পাতার উপরিতলে শুষ্কতা দেখা দেয়।
৪. বাষ্প	এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহের অতিরিক্ত পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং স্টোম্যাটা, লেন্সিসেল ও কিউটিকল দিয়ে নির্গত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত স্থান থেকে পানি সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়।
৫. জীবিত কোষ	এ প্রক্রিয়া জীবিত কোষে সংঘটিত হয় এবং প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	কোনো জীবিত কোষ এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে না। প্রোটোপ্লাজমের কোনো ভূমিকা নেই।
৬. প্রোটোপ্লাজম	প্রক্রিয়াটি প্রোটোপ্লাজম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।	প্রোটোপ্লাজমের কোনো ভূমিকা নেই।

ব্যবহারিক : পত্ররন্ধ্রের গঠন পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।

পরীক্ষার উপকরণ : একটি কচি যেকোনো বিষমপৃষ্ঠ পাতা, চিমটা, নিডল (সুঁচ), একটি স্লাইড, একটি ওয়াচ গ্লাস, একটি কভার স্লিপ, একটি তুলি, পরিমাণমত পানি, গ্লিসারিন, ড্রপার, স্যাফ্রানিন ও অণুবীক্ষণযন্ত্র।

কার্যপদ্ধতি : পাতার পৃষ্ঠ থেকে (ওপর বা নিচ, **নিচের পৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র বেশি থাকে**) নিডলের সাহায্যে আঁচড় দিয়ে চিমটা দিয়ে পাতার নিম্নত্বক পিল আকারে বিচ্ছিন্ন করে পানিপূর্ণ একটি ওয়াচ গ্লাসে রাখতে হবে। এরপর এতে সামান্য স্যাফ্রানিন দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে সেখান থেকে তুলে স্লাইডে ড্রপারের সাহায্যে দুই ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার ওপর পাতলা ত্বকটি রাখতে হবে এবং কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নিডল দিয়ে কভার স্লিপের ওপর হালকা চাপ দিয়ে স্লাইডের অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে ব্লটিং পেপার দিয়ে চুষে নিতে হবে। এরপর মাউন্ট করা স্লাইডটিকে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে প্রথমে কম ও পরে উচ্চশক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভে পাতার পত্ররন্ধ্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

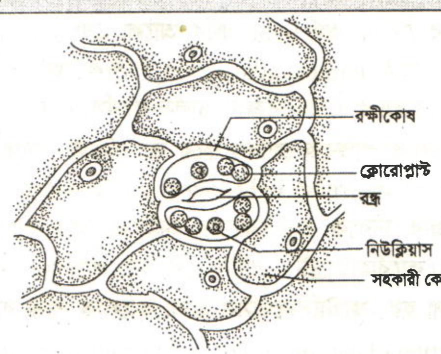

চিত্র ৯.১৫ : পত্ররন্ধ্রের গঠন।

পর্যবেক্ষণ : অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পাতার পাতলা ত্বকটিতে দেখা যাবে বেশ কিছু **পত্ররন্ধ্র**। প্রতিটি পত্ররন্ধ্রের গঠনে দেখা যাবে কেন্দ্রে একটি রন্ধ্র বা ছিদ্র। রন্ধ্রকে বেষ্টন করে দুটি **অর্ধচন্দ্রাকার রক্ষীকোষ বা গার্ড সেল**। রক্ষীকোষ দুটির প্রাচীরের পুরুত্ব সবদিকে সমান নয়। রন্ধ্রের দিকে প্রাচীরের পুরুত্ব বেশি এবং বাইরের দিকে প্রাচীরের পুরুত্ব কম বা পাতলা। উচ্চশক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভ দিয়ে দেখা যাবে যে, রক্ষীকোষের মধ্যে ঘন সাইটোপ্লাজম, একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস এবং অনেকগুলো ক্লোরোপ্লাস্ট।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় শব্দ

অভিস্রবণ (Osmosis) : একই দ্রাবকবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পাশাপাশি পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তার বেশি ঘনত্বের এলাকা হতে কম ঘনত্বের এলাকার দিকে ব্যাপিত (diffusion) হয় সে প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে।

ডিফিউশন (Diffusion) বা ব্যাপন : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে বিস্তার লাভ প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

অভিস্রবণিক চাপ (Osmotic Pressure) : একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রাবিশিষ্ট একটি দ্রবণ ও তার বিশুদ্ধ দ্রাবককে যদি একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পৃথক করে রাখা যায় তবে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক ঘন দ্রবণের প্রবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের অভিস্রবণিক চাপ বলে।

প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis) বা প্রোটোপ্লাজম সংকোচন : বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis) প্রক্রিয়ায় সজীব কোষস্থ পানি কোষের বাইরে বেরিয়ে আসার ফলে কোষের প্রোটোপ্লাজম সংকোচিত হওয়াকে প্লাজমোলাইসিস বলে।

টারজিডিটি (Turgidity) বা রসস্ফীতি : অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis) প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণের ফলে কোষের স্ফীত হওয়ার অবস্থাকে টারজিডিটি বলে।

টারগার প্রেশার (Turgor Pressure) বা স্ফীতি চাপ : টারজিডিটি তথা রসস্ফীতির জন্য প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক কোষপ্রাচীরের ওপর যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে টারগার প্রেশার বলে।

ইমবাইবিশন (Imbibition) : কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আংশিক শুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে **ইমবাইবিশন** বলে। যেসব পদার্থ পানি শোষণ করে স্ফীত হয় সেসব পদার্থকে **হাইড্রোফিলিক পদার্থ** বলে। যেমন— আঠা, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, জেলাটিন ইত্যাদি।

বাষ্পীভবন কী? (What is evaporation?) কোনো উন্মুক্ত স্থান থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীভবন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম জড়িত থাকে না। তাই এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া।

৯.৩ : ফটোসিনথেসিস (Photosynthesis) বা সালোকসংশ্লেষণ

গ্রিক *Photo* অর্থ light অর্থাৎ **আলো** এবং *synthesis* অর্থ **সংশ্লেষণ** অর্থাৎ একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে কোনো যৌগ পদার্থ সৃষ্টি। কাজেই Photosynthesis এর শাব্দিক অর্থ আলোর সাহায্যে কোনো যৌগ পদার্থ সৃষ্টি। Photosynthesis শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী **চার্লস বার্নেস** (C.R. Barnes) ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

আলোক শক্তিকে শোষণ করে তা সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোসিনথেসিস (The process of absorbing light energy and converting it into stored chemical energy is called photosynthesis.)

সজীব জীবকে তার কোষের কাঠামো গঠন করতে এবং জীবনধারণের প্রক্রিয়াসমূহ পরিচালনা করতে জটিল কার্বন যৌগের (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড) প্রয়োজন হয়। আলোক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। তাই বলা হয়, **ফটোসিনথেসিস হলো আলোক শক্তি ব্যবহার করে কোষে কার্বন যৌগ তৈরি করা** (Photosynthesis is the production of carbon compound in cells using light energy.)

এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় (i) CO_2, (ii) পানি, (iii) সূর্যালোক এবং (iv) ক্লোরোফিল। উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) এবং O_2। CO_2 ব্যবহৃত হয় কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য, পানি ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক শক্তি হিসেবে NADPH + H^+ তৈরির জন্য। সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় শক্তির জন্য এবং ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় সূর্যশক্তিকে শোষণ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য। এটি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। বিষয়টিকে একটু বিস্তারিত করে এভাবে লেখা যায় :

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ-কোষস্থ ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে ATP এবং NADPH + H^+ নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ঐ রাসায়নিক শক্তিকে (ATP ও NADPH + H^+) কাজে লাগিয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত ও উপজাত হিসেবে O_2 নির্গত করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস বলে।

নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়াটির মাধ্যমে উচ্চতর উদ্ভিদে সংঘটিত সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দেখানো যায়।

$$\underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{পানি}}{12H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2}$$

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১ অণু হেক্সোজ শর্করা প্রস্তুত করতে ৬ অণু CO_2 ও ১২ অণু H_2O প্রয়োজন পড়ে এবং ৫০-৬০ ফোটন কণা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সালোকসংশ্লেষণকে একটি জটিল **জারণ-বিজারণ** প্রক্রিয়া বলা হয়। কারণ এখানে H_2O থেকে একদিকে যেমন O_2 মুক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি CO_2 এর সাথে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১ অণু গ্লুকোজের সাথে ৬ অণু অক্সিজেন তৈরি হয়।

> পূর্ব পৃষ্ঠার বিক্রিয়াটির প্রতি লক্ষ্য করলে যে কারো মনে হতে পারে যে এ বিক্রিয়ায় বামদিকে ১২টি পানির ($12H_2O$) স্থলে ৬টি পানি দেখিয়ে বিক্রিয়ার ডানদিকে ৬টি পানি না দেখালেই হতো; অর্থাৎ বিক্রিয়াটিকে $6H_2O + 6CO_2 +$ আলোকশক্তি $\xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}}$ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ এমন লিখলেই হতো এবং বিক্রিয়াটি আরও সহজ হতো।
>
> এবার নিচের বিক্রিয়াটিতে C, H ও O এর পরিণতি লক্ষ্য করুন :
>
> 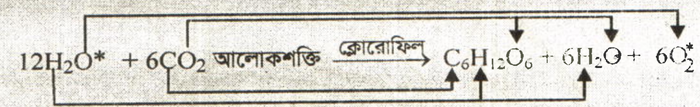
>
>
> এ বিক্রিয়ার মৌলিক বণ্টন থেকে দেখা যায় বামদিকের পানির ১২ পরমাণু অক্সিজেন সম্পূর্ণটাই মুক্ত অক্সিজেন হিসেবে বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন দ্রব্য হিসেবে বের হয়ে যায়। এর কোনোটাই ডানদিকে উৎপাদিত পানির অংশ হয় না। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পানি আর বিক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পানি এক নয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পানি এ প্রক্রিয়ার উপজাত পদার্থ। কাজেই বিক্রিয়ায় ১২ অণু পানির অংশগ্রহণই সঠিক।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি বোঝতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে।

সালোকসংশ্লেষণের অঙ্গ ও অঙ্গাণু : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **ক্লোরোপ্লাস্ট** নামক সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুতেই ঘটে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সবুজ শৈবাল, ব্রায়োফাইট্স, টেরিডোফাইট্স, জিমনোস্পার্ম এবং অ্যানজিওস্পার্ম উদ্ভিদে। সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, তবে থাইলাকয়েডের গায়ে ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট থাকে। অন্যান্য কিছু শৈবাল (লোহিত শৈবাল, বাদামি শৈবাল ইত্যাদি) পিগমেন্টসমূহ **ক্রোম্যাটোফোর** (chromatophore) নামক অঙ্গাণুতে থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টের অবস্থান : ক্লোরোপ্লাস্টই হলো সালোকসংশ্লেষণের স্থান। উদ্ভিদের যে অঙ্গে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সে অঙ্গ সবুজ হয়; তাই অন্যভাবে বলা যায়, উদ্ভিদের সবুজ অংশে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সবুজ শৈবাল, *Riccia, Marchantia*-র মতো থ্যালয়েড ব্রায়োফাইট্স-এর প্রায় সমস্ত দেহেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। তবে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের কচি কাণ্ড ও পাতায় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সবচেয়ে বেশি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে পাতায়, **তাই সামগ্রিক বিবেচনায় সবুজ পাতাকেই ফটোসিনথেসিস-এর প্রধান অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।**

পাতার **মেসোফিল টিস্যুতেই** ক্লোরোপ্লাস্ট বিন্যস্ত থাকে। পাতার নিচের ত্বকে অনেক স্টোম্যাটা থাকে। স্টোম্যাটার মাধ্যমে বাতাস থেকে CO_2 গৃহীত হয় এবং ভেতর থেকে বাতাসে O_2 নির্গত হয়। ফলে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া সহজ হয়।

> **ফটোসিনথেসিস অঙ্গ :** উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ, বিশেষত সবুজ পাতা।
> **ফটোসিনথেসিস অঙ্গাণু :** ক্লোরোপ্লাস্ট।
> **ফটোসিনথেসিস-এর স্থান :** ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড।

রঞ্জক পদার্থ : যেসব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষণে জড়িত সেগুলো হচ্ছে-ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েডস ও ফাইকোবিলিনস।

ক্লোরোফিল (Chlorophyll) : ক্লোরোফিল হলো জীবকোষের ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থিত সবুজ বর্ণের রঞ্জক পদার্থ যা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। ক্লোরোফিল পিগমেন্ট প্লাস্টিড তথা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে, আর ক্লোরোপ্লাস্ট পাতার মেসোফিল টিস্যুতে অধিক পরিমাণে থাকে। সাধারণত উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল 'a' (chl 'a'), ক্লোরোফিল 'b' (chl 'b'), জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিন পিগমেন্টসমূহ থাকে। **chl 'a' হলদে-সবুজ বর্ণের, chl 'b' নীলাভ-সবুজ বর্ণের, জ্যান্থোফিল হলুদ এবং ক্যারোটিন কমলা বর্ণের।** এগুলো ছাড়াও ব্যাকটেরিয়া এবং শৈবালে ভিন্ন ধরনের ক্লোরোফিল থাকে।

ক্লোরোফিল-b এবং ক্যারোটিনয়েডকে সহযোগী পিগমেন্ট বা অ্যানটেনা কমপ্লেক্স বলে, কারণ এদের শোষিত আলোক শক্তি ক্লোরোফিল-a কে প্রদান করে। **ক্লোরোফিল- 'a' হলো সক্রিয় অণু**। ক্লোরোফিলের আণবিক সংকেত নিম্নরূপ :

ক্লোরোফিল 'a' : $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$; **ক্লোরোফিল 'b'** : $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$.

ক্যারোটিনয়েডস (Carotinoids) : ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ ক্লোরোফিল ছাড়াও হলুদ, কমলা, বাদামি প্রভৃতি বর্ণের রঞ্জক থাকে। এগুলোকে একসাথে **ক্যারোটিনয়েডস** বলে। এদের মধ্যে **ক্যারোটিন** (carotene) **কমলা বর্ণের** এবং **জ্যান্থোফিল** (xanthophyll) **হলুদ বর্ণের**। এদের আণবিক সংকেত—**ক্যারোটিন :** $C_{40}H_{56}O$; **জ্যান্থোফিল :** $C_{40}H_{56}O_2$।

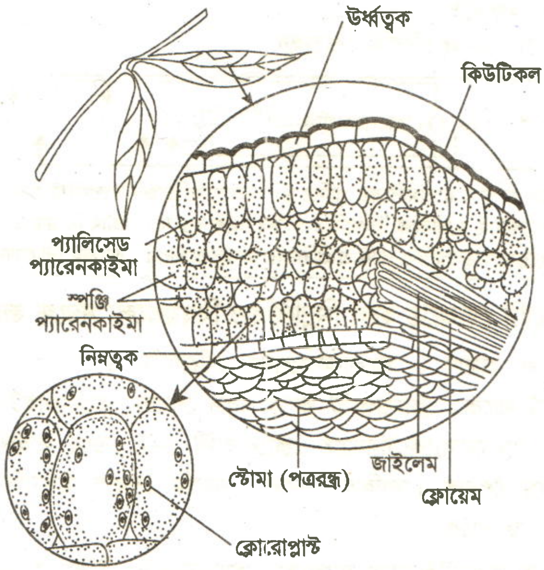

চিত্র ৯.১৬ : পাতার প্রস্থচ্ছেদে সালোকসংশেষণ অঙ্গ দেখানো হয়েছে।

ফাইকোবিলিনস (Phycobilins) : নীল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম **ফাইকোসায়ানিন** এবং লাল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম **ফাইকোইরেথ্রিন**। এ দুটি রঞ্জক পদার্থকে একত্রে **ফাইকোবিলিনস** বলে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও লোহিত শৈবালে এদের পাওয়া যায়। এদের আণবিক সংকেত—**ফাইকোসায়ানিন:** $C_{34}H_{44}O_8N_4$; **ফাইকোইরেথ্রিন:** $C_{34}H_{46}O_8N_4$। **সালোক-সংশ্লেষণের জন্য মূল পিগমেন্ট হলো ক্লোরোফিল-a**। ক্যারোটিনয়েডস এবং ফাইকোবিলিনস হলো আনুষঙ্গিক পিগমেন্ট বা **অ্যানটেনা পিগমেন্ট** কারণ এরা আলোকশক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল- a কে প্রদান করে।

আলোর পরিচয়

আলো একধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ। এর উৎস হলো সূর্য। সূর্য একটি বিরাট উত্তপ্ত পরমাণু চুল্লি। এখানে অনবরত হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিকিরিত হয়, তাকে **ফোটন কণা** বলে। এক্স-রে ও গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম এবং ইনফ্রারেড ও রেডিও-রে-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বেশি। **আলোর তরঙ্গের শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো আমরা দেখতে পাই যা সাদা আলো নামে পরিচিত**।

আলোর বর্ণালি (Light spectrum) : দৃশ্যমান আলো অনেকগুলো তরঙ্গের (spectra) সমষ্টি মাত্র। দৃশ্যমান আলোর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য যে এককে প্রকাশ করা হয় তাকে **ন্যানোমিটার** (nanometer = nm; ১ nm = 10^{-9} m) বলে। দৃশ্যমান আলো একটি প্রিজম-এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো হলে অন্তস্থ যে তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে তা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এর মধ্যে মোট সাত ধরনের তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে যার সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হলো ৩৯০ nm এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৭৬০ nm। এসব তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌছালে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে ধরা পড়ে। এগুলো হলো—বেগুনি (violet), নীল (indigo), নীলাভ-সবুজ বা আসমানী (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং

লাল (red)। এগুলোর আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম **বেনিআসহকলা** বা VIBGYOR হয়েছে। একে **আলোর বর্ণালি** বলে। নিচে বর্ণালির নাম ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য উল্লেখ করা হলো।

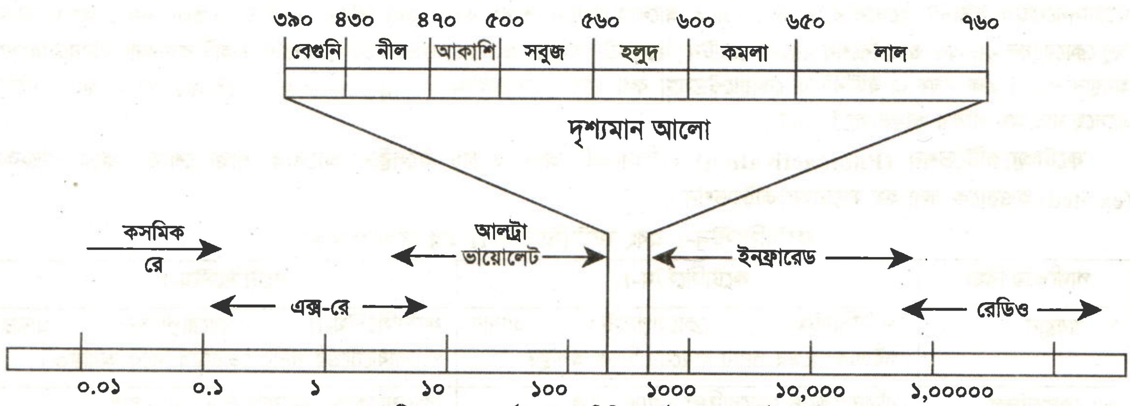

চিত্র ৯.১৭ : সূর্যালোকের বিভিন্ন বর্ণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

আলোর শোষণ বর্ণালি (Absorption spectrum) : আলো কোনো বস্তুর ওপর পতিত হলে তার কিছু অংশ শোষিত হয়। বস্তুর ওপর পতিত আলোর বিভিন্ন আলোক তরঙ্গের যে পরিমাণ শোষিত হয়, তাকে **শোষণ বর্ণালি** (absorption spectrum) বলে। আপতিত সূর্যালোকের ৮৩% ক্লোরোপ্লাস্ট কর্তৃক শোষিত হয়, ১২% বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় এবং বাকি ৫% ভূগর্ভে প্রতিসরিত বা বিলীন হয়। পাতায় শোষিত সৌররশ্মির মোট পরিমাণের মাত্র ০.৫–৩.৫% ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ কর্তৃক শোষিত হয়।

আলোর কার্যকর বর্ণালি (Action spectrum) : ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আলোর কার্যক্ষমতাকে বলা হয় কার্যকর বর্ণালি। সালোকসংশ্লেষণের সময় **বেগুনি-নীল** ও **কমলা-লাল** আলো বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বাকি আলো অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। একক আলো হিসেবে **লাল আলোতে** সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। [DAT 17-18]

ফটোসিস্টেম (Photosystem) : ক্লোরোফিল অণুসমূহ, সাথী অ্যান্টেনা পিগমেন্ট অণুসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহীতাসমূহ একসাথে একটি **ইউনিট** হিসেবে অবস্থান করে ও কাজ করে। এ ইউনিটকে ফটোসিস্টেম বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থিত আলোক শোষণকারী কমপ্লেক্সকেই (Light harvesting Complex) ফটোসিস্টেম বলা হয় । প্রতিটি ফটোসিস্টেমে (i) একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র (reaction centre), কয়েক শত অ্যানটেনা পিগমেন্ট (যারা আলোকশক্তি শোষণ করে বিক্রিয়া কেন্দ্রে ক্লোরোফিল-এ কে প্রদান করে) এবং (iii) একটি প্রাথমিক ইলেকট্রন গ্রহীতা থাকে।

থাইলাকয়েড মেমব্রেনে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পাশাপাশি দু' প্রকার ফটোসিস্টেম থাকে; যথা– (i) ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এবং ফটোসিস্টেম-২ (PS-II). PS-I আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং PS-II পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা অনুসারেই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

PS-I (ফটোসিস্টেম-I) এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a অণুটি ৭০০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক অত্যন্ত প্রবলভাবে শোষণ করে, তাই একে বলা হয় P700।

PS-II (ফটোসিস্টেম-II) এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a অণুটি ৬৮০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক অত্যন্ত প্রবলভাবে শোষণ করে, তাই একে বলা হয় P680। [DAT-10-11]

প্রতিটি ফটোসিস্টেমের তিনটি অংশ থাকে; যথা—১। আলোক শোষণ অংশ (light harvesting part), ২। বিক্রিয়া কেন্দ্র এবং (reaction centre) ৩। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)।

P700 এবং P680 অন্যান্য ক্লোরোফিল অণুর সাথে গঠনগতভাবে একই রকম। ফটোসিস্টেমে বিদ্যমান প্রোটিনের সাথে বিশেষ ইন্টারঅ্যাকশনের কারণে সূর্যশক্তি শোষণে এদের বিশেষ প্যাটার্ন রয়েছে। এদিক থেকে এরা পৃথক ধরনের।

দুটি ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধির ঘটনাকে **এমারসন প্রভাব** (Emerson effect) বলে।

ফটোসিনথেটিক ইউনিট (Photosynthetic Unit) : ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থিত ফটোসিস্টেমই ফটোসিনথেটিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এতে আলোর ফোটন শোষণ করার জন্য বিভিন্ন রঞ্জক অণু (৩০০–৪০০ অণু), সক্রিয় অণু ক্লোরোফিল-a; এক গুচ্ছ বিশেষ ধরনের প্রোটিন, ইলেকট্রন গ্রহীতা ও ETC গুচ্ছাকারে পাশাপাশি একটি কার্যকরী ইউনিট হিসেবে অবস্থান করে। এক সময় এ ইউনিটকে **কোয়ান্টোসোম** বলা হতো। কোয়ান্টাম (L. quantus: how great) থেকে কোয়ান্টোসোম এসেছে যার অর্থ শক্তির অবিভাজ্য ইউনিট।

ফটোঅ্যাকটিভেশন (Photoactivation) : পিগমেন্ট অণুর একটি ইলেকট্রন আলোক শক্তি শোষণ করে শক্তিকৃত (excited) হওয়াকে বলা হয় **ফটোঅ্যাকটিভেশন**।

ফটোসিস্টেম-I এবং ফটোসিস্টেম-II এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ফটোসিস্টেম-I	ফটোসিস্টেম-II
১। অবস্থান	ফটোসিস্টেম-I ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েডের পর্দার বাইরের দিকে অবস্থিত।	ফটোসিস্টেম-II ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েডের পর্দার ভেতরের দিকে অবস্থিত।
২। ক্লোরোফিল	বিক্রিয়াকেন্দ্রে ক্লোরোফিল a-700 থাকে।	বিক্রিয়াকেন্দ্রে ক্লোরোফিল a-680 থাকে।
৩। সম্পর্ক	চক্রীয় এবং অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।	কেবলমাত্র অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৪। পরিমাণ	অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ক্লোরোফিল a থাকে।	অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ক্লোরোফিল a থাকে।
৫। NADP	NADP বিজারণে ইলেকট্রন প্রদান করে।	NADP বিজারণে প্রোটন প্রদান করে।
৬। ঘাটতি ইলেকট্রন	PS-II থেকে এসে পূরণ হয়।	পানি থেকে এসে পূরণ হয়।
৭। ফটোলাইসিস	এটি ফটোলাইসিস-এর সাথে সংযুক্ত নয়।	এতে সংযুক্ত থাকে পানি বিশ্লেষণকারী এনজাইম এবং পানি বিশ্লেষিত হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অক্সিজেন তৈরি হয়।
৮। বিক্রিয়া কেন্দ্র	700 nm	680 nm

বিক্রিয়া কেন্দ্র (Reaction Centre)

ফটোসিস্টেমের একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র থাকে। বিক্রিয়া কেন্দ্রে অল্পসংখ্যক প্রোটিন থাকে। প্রতিটি প্রোটিন একদিকে একজোড়া বিশেষ ধরনের ক্লোরোফিল-a এর সাথে এবং অপরদিকে একটি প্রাথমিক ইলেকট্রনগ্রহীতার সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রাথমিক ইলেকট্রনগ্রহীতা থেকে ইলেকট্রনটি একটি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)-এর মাধ্যমে অগ্রসরমান হয়। বিক্রিয়া কেন্দ্রের বিশেষ ক্লোরোফিল একটি ইলেকট্রন প্রাথমিক ইলেকট্রনগ্রহীতাকে প্রদান করলেই শোষিত আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বিক্রিয়া কেন্দ্র থাইলাকয়েড মেমব্রেনের বাইলেয়ারে অবস্থিত।

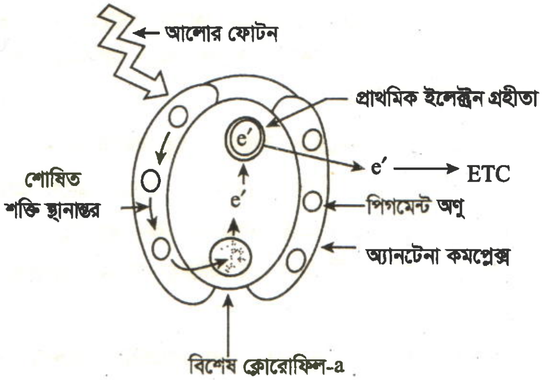

চিত্র ৯.১৮ : একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র : তীর চিহ্নের মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তর ও ইলেকট্রন স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

এটমের নিম্নশক্তি বলয় ও উচ্চশক্তি বলয়ের মাঝে শক্তির যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তা অবশ্যই শোষিত আলোক শক্তির সমান হতে হবে। এ শক্তি সমান না হলে আলোর ফোটন শোষিত হবে না।

পানির সালোকবিভাজন (Photolysis of water)

ফটোসিস্টেম-II (PS II) তে পানি অণুর বিভাজন ঘটে যার ফলে ইলেকট্রন (e^-), প্রোটন (H^+) এবং অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। PS II হতে ইলেক্ট্রন বের হয়ে প্রাথমিক ইলেক্ট্রনগ্রহীতায় চলে গেলে P680 অক্সিডাইজড্ হয় এবং প্রচণ্ডভাবে ইলেক্ট্রোনেগেটিভ হয়। এর ফলে $P680^+$ শক্তি প্রয়োগ করে পানি অণু ভেঙ্গে ইলেক্ট্রন বের করে দিতে পারে। বায়োলজিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অক্সিডেন্ট হলো $P680^+$। একটি এনজাইম সাব ইউনিট (water splitting enzyme) পানি ভাঙ্গনে সহায়তা করে। এছাড়া Mn^{++} এবং Cl^- আয়নও এতে সহায়তা করে। এটি থাইলাকয়েড মেমব্রেনে প্রকোষ্ঠের দিকে থাকে। এক অণু অক্সিজেন ত্যাগ করতে হলে দু' অণু পানি বিশ্লেষিত হতে হয়, এতে চারটি ইলেক্ট্রন সৃষ্টি হয়।

$$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$

PS II হতে একটি ইলেক্ট্রন ETC দিয়ে প্রবাহিত হয়ে $NADP^+$ পর্যন্ত পৌছাতে আলোর **২টি ফোটনের** প্রয়োজন পড়ে। একটি ফোটন শোষণ করে PS II এবং একটি ফোটন শোষণ করে PS I. এটি শুরু হয় পানির অক্সিডেশন ও অক্সিজেন তৈরির মাধ্যমে। প্রতিটি $NADPH + H^+$ তৈরির জন্য ২টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়।

[শ্বসনে $NADH + H^+$ থেকে e^- স্বতঃস্ফূর্তভাবে O_2 এ মিলিত হয়ে পানি তৈরি করে। আর ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়াতে শক্তি খরচ করে পানি থেকে ইলেক্ট্রন $NADP^+$ তে যায়। শ্বসনে উচ্চশক্তির $NADH + H^+$ থেকে অল্প শক্তির পানি তৈরি হয়। আর ফটোসিনথেসিস-এ অল্প শক্তির পানি হতে উচ্চশক্তির $NADPH + H^+$ তৈরি হয়।]

অক্সিজেন (O_2) এবং H^+ উপজাত (by product) হিসেবে উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন বর্জ্যবস্তু তাই পরিবেশে ত্যাজ্য হয়। H^+ প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট (Proton gradient) তৈরি করে।

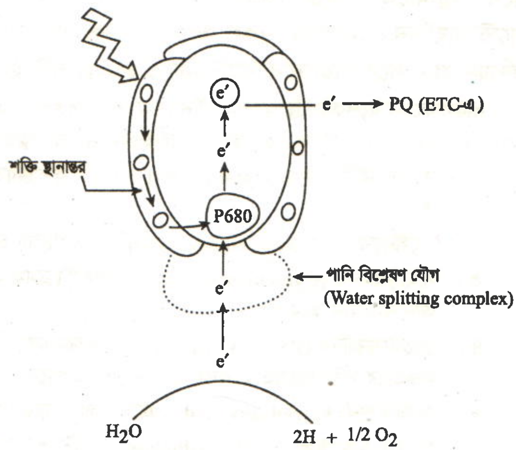

চিত্র ৯.১৯ : PS-II (P 680) এবং ফটোলাইসিস প্রক্রিয়া।

দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে প্রথমেই স্নায়ু কোষের মৃত্যু ঘটে। পানির বিভাজন কেবলমাত্র আলোর উপস্থিতিতে ঘটে থাকে তাই এর নাম দেয়া হয়েছে **ফটোলাইসিস** (Photolysis)। [DAT 21-22]

ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত ঘটনা বিজ্ঞানিগণ উন্মোচন করেছেন। ফটোসিস্টেম-II পানির অণু ভেঙ্গে অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেন এবং ইলেক্ট্রন পৃথক করে তা দিয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানিগণ এখন চাচ্ছেন এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হাইড্রোজেন ও ইলেক্ট্রনকে কার্বোহাইড্রেট তৈরির পরিবর্তে সরাসরি ইলেক্ট্রিসিটি বা জ্বালানি করতে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ইলেক্ট্রিসিটি বা জ্বালানি হবে **'গ্রিন এনার্জি'** যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না। বিজ্ঞানিগণ এতে কিছুটা সফলও হয়েছেন।

২০১১ সালে Massachusette Institute of Technology-র বিজ্ঞানিগণ একটি কৃত্রিম পাতা উদ্ভাবনের ঘোষণা দেন। এ কৃত্রিম পাতাটি পানিতে রেখে সূর্যালোকে স্থাপন করার ফলে এটি পানির অণু ভেঙ্গে H_2 ও O_2 গ্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে ইলেক্ট্রিসিটি উৎপন্ন করে।

ATP ও NADPH + H^+ তৈরি : (i) **ATP** (Adenosine Triphosphate) একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ। জীবকোষে রাসায়নিক শক্তির উৎস হিসেবে ATP কাজ করে। ADP (Adenosine Diphosphate) এর সাথে একটি অজৈব (Pi) ফসফেট যুক্ত হয়ে একটি ATP তৈরি হয়।

$$ADP + Pi \xrightarrow{ATP\text{-}ase} ATP + H_2O$$

আলোক শোষণের ফলে পর্যাপ্ত ইলেকট্রন-এনার্জির সহায়তায় ATP-ase এনজাইম এর কার্যকারিতায় ADP এর সাথে Pi যুক্ত হয়ে ATP তৈরি হয়। **থাইলাকয়েড (thylakoid) এর যে সার্ফেস স্ট্রোমার (stroma) দিকে থাকে সে দিকে ATP তৈরি হয়।** একটি ATP অণুতে প্রচুর শক্তি মজুত থাকে। প্রয়োজনে ATP-র মজুতকৃত শক্তি কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য সরবরাহ করে। তাই

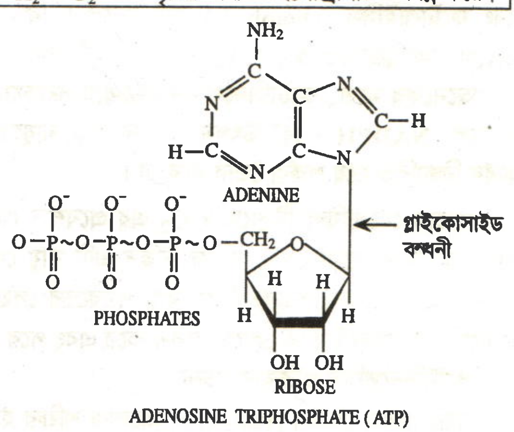

চিত্র ৯.২০ : ATP-এর গঠন।

ATP-কে জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা (Biological coin or Energy coin) **বলা হয়।** ব্রিটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ Peter Mitchel ATP সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি প্রস্তাব করেন। ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন।

(ii) **NADP :** NADP (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) একটি কো-এনজাইম। NADP থেকে তৈরি হয় NADPH + H^+। এ বিক্রিয়ায় একটি reductase এনজাইম (লৌহঘটিত প্রোটিন) কাজ করে। CO_2-কে কার্বোহাইড্রেটে স্থিতিকরণ ও বিজারণে NADPH + H^+ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্ভিদদেহের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে অসংখ্য থলে সদৃশ গঠন থাকে, এদেরকে **থাইলাকয়েড** বলে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনের যে অংশ তার নিজস্ব প্রকোষ্ঠের দিকে উন্মুক্ত সেখানে PS-II ইউনিটসমূহ বিদ্যমান; থাইলাকয়েড মেমব্রেনের যে অংশ স্ট্রোমাতে উন্মুক্ত সেখানে PS-I এবং ATP synthase ইউনিট থাকে; সাইটোক্রোম যৌগ, প্লাস্টোকুইনন, প্লাস্টোসায়ানিন মেমব্রেনের সকল অংশে সমানভাবে বিদ্যমান। **প্রকৃতিতে PS-II এর বহু পূর্বে PS-I সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র ৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে PS-II সৃষ্টি হয়।**

থাইলাকয়েড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (TETC) : থাইলাকয়েড মেমব্রেনে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন বাহক নিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC) গঠিত। বাহকগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নরূপ :

১। **ফিয়োফাইটিন (Pheophytin = Ph) :** একটি রূপান্তরিত ক্লোরোফিল-a অণু। পরবর্তী বাহক প্লাস্টোকুইননের সাথে এটি সংযোগ সৃষ্টি করে।

২। **প্লাস্টোকুইনন (Plastoquinone = PQ) :** অতি ছোটো চলনশীল লিপিড যা থাইলাকয়েড মেমব্রেনে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।

৩। **সাইটোক্রোম (Cytochrome = Cyt.) :** সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম (heme) গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন। হিম গ্রুপের লৌহ ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে।

৪। **প্লাস্টোসায়ানিন (Plastocyanin = PC) :** অত্যন্ত চলনশীল একটি ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন। এর ইলেকট্রন গ্রহীতা গ্রুপ হলো কপার। এটি মুক্তভাবে থাইলাকয়েড প্রকোষ্ঠে চলাচল করতে পারে।

৫। **ফেরিডক্সিন (Ferredoxin = Fd) :** এটি একটি আয়রন-সালফার (Fe-S) প্রোটিন। এর লৌহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে ও বিতরণ করে।

৬। **NADP-রিডাক্টেজ (NADP reductase) :** এটি আসলে একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এবং বাউন্ড কো-এনজাইম FAD (ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড)। এর ফ্ল্যাভিন গ্রুপ হলো ইলেকট্রন গ্রহীতা।

সালোকসংশ্লেষণে পানি সরবরাহ : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ফটোসিনথেসিস-এর প্রধান স্থান হলো পাতার মেসোফিল টিস্যুর কোষস্থ ক্লোরোপ্লাস্ট। কাজেই পাতার মেসোফিল কোষে অব্যাহত পানি সরবরাহ নিশ্চিত হতে হবে।

উদ্ভিদ তার মূলরোম দিয়ে (কখনো রাইজয়েড দিয়ে) মাটি কণা ফাঁকের কৈশিক পানি শোষণ করে। শোষিত পানি ক্রমান্বয়ে কর্টেক্স পার হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা পার হয়ে পাতায় পৌঁছায়। পাতার শিরাবিন্যাসের মাধ্যমে উক্ত পানি সমস্ত পত্রফলকের মেসোফিল টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত অসমোসিস প্রক্রিয়ায় পানি প্রথমে কোষাভ্যন্তরে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে। উক্ত পানি ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং **ফটোলাইসিস** (photolysis) তথা সালোক বিভাজনের মাধ্যমে ভেঙে O_2 হিসেবে বায়ুতে নির্গত হয় এবং $2H^+$, NADP-কে বিজারিত করে NADPH + H^+ সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়।

অনেকের মতে, ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হলো পানির ভাঙ্গন (ফটোলাইসিস), কারণ তা না হলে NADPH + H^+ উৎপন্ন হবে না এবং বায়ুতে O_2 আসবে না। আত্তীকরণ শক্তি NADPH + H^+ তৈরি না হলে কার্বন বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি হবে না।

পাতার মেসোফিল টিস্যুতে CO_2-এর প্রবেশ : CO_2 ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান, কারণ শর্করা সৃষ্টির প্রধান কাঁচামাল হলো CO_2, সবুজ উদ্ভিদ এটি বায়ু থেকে গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে ০.০৩৫% CO_2 (বর্তমানে ০.০৪%) থাকে। পাতায় খোলা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বায়ু পত্ররন্ধ্রের পেছনের বায়ুকুঠুরী পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। বায়ুকুঠুরী হতে CO_2 ব্যাপনের মাধ্যমে মেসোফিল টিস্যুর কোষে প্রবেশ করে এবং পরে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।

ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার সূচনা

সূর্যালোকের ফোটন (Photon = আলোক শক্তির ইউনিট) উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গে (প্রধানত পাতা) পতিত হলে অভ্যন্তরস্থ ক্লোরোপ্লাস্টের ক্লোরোফিল অণু তা শোষণ করে সক্রিয় হয়। সক্রিয় ক্লোরোফিল অণুর মাথার ডবল বন্ড থেকে একটি ইলেকট্রন

শক্তিকৃত হয়ে এটমের নিম্ন বলয় থেকে উচ্চ বলয়ে চলে আসে। **এটমে শক্তির উচ্চ বলয় হতে ইলেক্ট্রনটি প্রাথমিক ইলেক্ট্রন গ্রহীতা গ্রহণ করলে ফটোসিনথেসিস-এর সূচনা ঘটে।**

উচ্চশক্তি বলয়ে আসা ইলেক্ট্রনের ভাগ্য নিম্নেবর্ণিত তিন প্রকারের যেকোনো এক প্রকার হতে পারে :

১। উচ্চশক্তি বলয় হতে শক্তি হারিয়ে পুনরায় নিম্নশক্তি বলয়ে ফিরে যাওয়া। এক্ষেত্রে শোষিত শক্তি তাপশক্তি হিসেবে মুক্ত হয় বা ফ্লুরেসেন্স (fluorescence) হিসেবে বিকিরিত হয়। সালোকসংশ্লেষণে এ শক্তি কাজে আসে না।

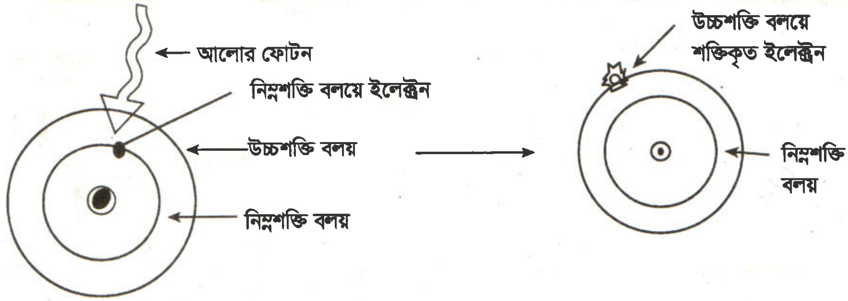

চিত্র ৯.২১ : এটমে শক্তি বলয় : নিম্নশক্তি বলয় থেকে শক্তিকৃত ইলেকট্রন উচ্চশক্তি বলয়ে উন্নীত।

২। শোষিত শক্তি পাশের কোনো পিগমেন্টের অণুর ইলেক্ট্রনকে দিয়ে উচ্চ বলয়ের ইলেক্ট্রনটি নিম্নশক্তি বলয়ে ফিরে যাওয়া। এক্ষেত্রে শক্তি স্থানান্তর হয়—ইলেক্ট্রন নয়। এভাবেই অ্যান্টেনা কমপ্লেক্সের শোষিত আলোক শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে বিক্রিয়া কেন্দ্রের বিশেষ ক্লোরোফিল-a-তে আসে।

৩। উচ্চশক্তি বলয় হতে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনটি একটি প্রাথমিক ইলেক্ট্রন গ্রহীতাকে প্রদানে সমর্থ হওয়া। এক্ষেত্রে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনটি স্থানান্তরিত হয় এবং ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কলাকৌশল (Mechaism of Photosynthesis)

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ **ব্ল্যাকম্যান** (Blackman) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেন; যথা– **(ক) আলোকনির্ভর অধ্যায়** এবং **(খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়।**

[MAT 18-19]

(ক) আলোকনির্ভর অধ্যায় (Light dependent phase) : এ অধ্যায়ে ATP ও NADPH + H^+ তৈরি হয়।

আলোকনির্ভর অধ্যায়ের বিক্রিয়াসমূহ **থাইলাকয়েড মেমব্রেন**-এ সংঘটিত হয়। **সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে অধ্যায়ে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও NADPH + H^+ তে সঞ্চারিত হয়, তাকে আলোকনির্ভর অধ্যায় বলে। এ অংশের জন্য আলোক অপরিহার্য।**

ক্লোরোফিল অণু আলোকরশ্মির ফোটন (photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন হতে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ATP তৈরি করে। এ ছাড়া আলোক অধ্যায়ে H_2O ভেঙে O_2 নির্গত হয় এবং NADP বিজারিত হয়ে NADPH + H^+ তৈরি হয়। আলোকনির্ভর অধ্যায়কে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হয় :

$$2ADP + 2Pi + 2NADP + 4H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} 2ATP + 2NADPH + H^+ + 2H_2O + O_2$$

উচ্চশক্তিসম্পন্ন ATP ও NADPH + H^+ সৃষ্টি করতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা সূর্যালোক হতে আসে। **সূর্যালোকের শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে।** CO_2 আত্তীকরণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করতে ATP ও NADPH + H^+ এর শক্তি ব্যবহৃত হয় বলে ATP ও NADPH + H^+ কে **আত্তীকরণ শক্তি** (assimilatory power) বলে।

[DAT 19-20; MAT 15-16]

ফটোফসফোরাইলেশন : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন; আর আলোকশক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। **আরনন** (Arnon) ও তাঁর সহকর্মীগণ ১৯৫৭

খ্রিষ্টাব্দে ফটোফসফোরাইলেশন সম্পর্কে ধারণা দেন। ফটোফসফোরাইলেশন **অচক্রীয়** (non-cyclic) এবং **চক্রীয়** (cyclic) এ দু'ভাবে হতে পারে। বর্তমান ধারণার আলোকে এদেরকে নিচে বর্ণনা করা হলো :

(১) অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন : যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-II হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন পুনরায় সেখানে ফিরে না গিয়ে, ফটোসিস্টেম-I এ চলে আসে তাকে **অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম- I এবং ফটোসিস্টেম-II উভয়ই অংশ গ্রহণ করে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

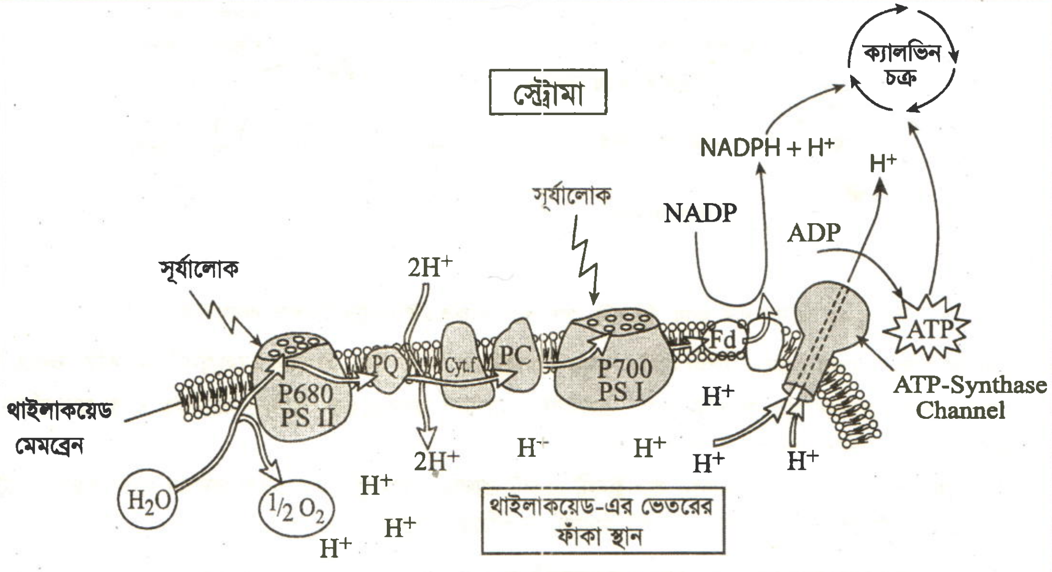

চিত্র ৯.২২ : অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (আধুনিক ধারণা)। থাইলাকয়েডের মেমব্রেনে ফটোসিস্টেম ও ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন-এর অবস্থান এবং ফটোলাইসিস, ইলেকট্রন প্রবাহ এবং ATP ও NADPH + H^+ তৈরি।

(i) ফটোসিস্টেম-II (PS-II) এর ক্লোরোফিল অণু আলোকশক্তি শোষণ করে। শোষিত আলোকশক্তি এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্রিয়া কেন্দ্র (reaction centre) P680-তে পৌঁছে। বিক্রিয়া কেন্দ্র শক্তিকৃত ইলেকট্রনকে গ্রহীতার কাছে পাঠাতে পারে।

(ii) P680 এর অরবিট হতে শক্তিকৃত ২টি ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয় যা নিকটস্থ ইলেকট্রন গ্রহীতা **ফিয়োফাইটিন** (ছকে দেখানো হয়নি) কর্তৃক গৃহীত হয়। একই সময়ে পানি ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট ২টি ইলেকট্রন এসে P680 এর ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে।

(iii) ফিয়োফাইটিন হতে ইলেকট্রন ২টি সাথে সাথেই **প্লাস্টোকুইনন**-এ (PQ) স্থানান্তরিত হয়। PQ একটি লিপিড ও চলনশীল বাহক।

(iv) PQ তার ইলেকট্রন **সাইটোক্রোম-এফ** (Cyt. f) কে প্রদান করে পুনরায় ফিয়োফাইটিন হতে ইলেকট্রন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। এ ধাপে যে শক্তি নির্গত হয় তা দিয়ে ADP এর সাথে অজৈব ফসফেট সংযুক্ত হয়ে একটি ATP তৈরি হয়। **(প্রকৃতপক্ষে ATP তৈরি হয় পৃথকভাবে কেমিঅসমোটিক প্রক্রিয়ায় চিত্র-৯.২৩।)**

(v) সাইটোক্রোম-এফ, ইলেকট্রন ২টি **প্লাস্টোসায়ানিন** (PC)-কে প্রদান করে। PC একটি মেমব্রেন প্রোটিন।

(vi) প্লাস্টোসায়ানিন (PC) ফটোসিস্টেম-I (PS-I) এর P700 কে ইলেকট্রন প্রদান করে (কারণ ইতোমধ্যেই PS-I কর্তৃক আলোকশক্তি শোষণের ফলে P700 বিক্রিয়া কেন্দ্রে ক্লোরোফিল- a অণুর অরবিট হতে দুটি শক্তিকৃত ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং তথায় ইলেকট্রনের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে)।

(vii) P 700 হতে উৎক্ষিপ্ত ২টি **ইলেকট্রন ফেরিডক্সিন** (Fd) গ্রহণ করে।

(viii) Fd হতে ২টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে NADP-reductase। NADP reductase দুটি ইলেকট্রন (P700 বিক্রিয়া কেন্দ্র হতে উৎক্ষিপ্ত) এবং দুটি প্রোটন (পানির ভাঙন হতে সৃষ্ট) সহযোগে NADP কে বিজারিত করে NADPH + H+ তৈরি করে। ATP ও NADPH + H^+ পরবর্তীতে ক্যালভিন চক্রে অংশগ্রহণ করে।

PS-II হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন পুনরায় সেখানে ফিরে না গিয়ে PS-I-এ চলে আসে।

ফটোসিস্টেম-II যে ইলেক্ট্রন হারায় পানি হতে ইলেক্ট্রন এসে তা পূরণ করে। অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন অব্যাহতভাবে পানি থেকে PS-II-তে ইলেক্ট্রন সরবরাহ হতে থাকে।

(২) চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন : যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-I হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন বিভিন্ন বাহক ঘুরে (একটি ATP তৈরি পূর্বক) পুনরায় ফটোসিস্টেম-I-এ ফিরে আসে তাকে **চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় কেবল ফটোসিস্টেম-I (PS-I) অংশগ্রহণ করে। ফটোসিস্টেম-I (PS-I) এর ক্লোরোফিল অণু আলোক ফোটন শোষণ করে শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং এ শক্তি বিক্রিয়া কেন্দ্রে (P700) স্থানান্তরিত হয়। পরে P700 ক্লোরোফিল- a অণু হতে দুটি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়। উচ্চশক্তিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রন ফেরিডক্সিন (Fd)-এ যায়। পরে Fd হতে ইলেক্ট্রন প্লাস্টোকুইনন (PQ)-এ স্থানান্তরিত হয়। PQ হতে ইলেক্ট্রন Cyt. f.-এ আসে। এ সময় ইলেক্ট্রনের মুক্ত শক্তি দ্বারা ADP ও Pi সহযোগে

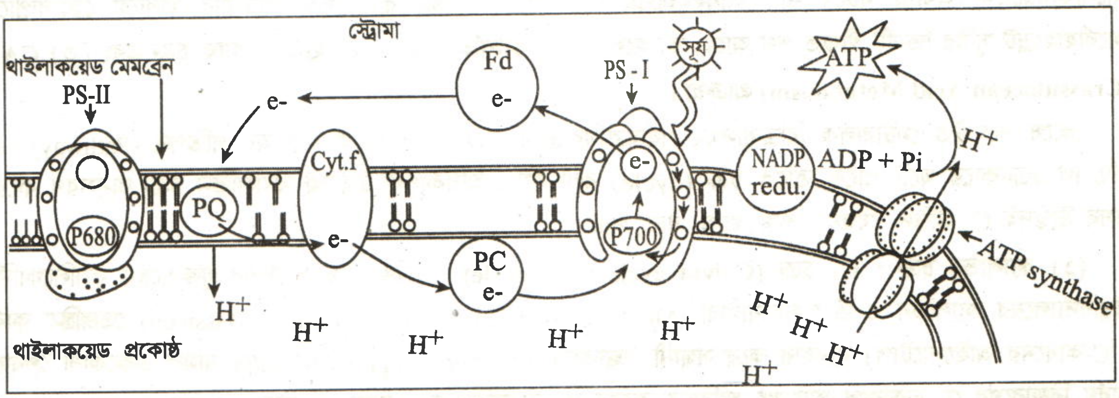

চিত্র ৯.২৩ : চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (আধুনিক ধারণা) : P700 (PS-I), Fd-ফেরিডক্সিন, PQ = প্লাস্টোকুইনন, PC = প্লাস্টোসায়ানিন, Cyt.f = সাইটোক্রোম। e^- = ইলেক্ট্রন। লক্ষ্যণীয় : e^- P700 থেকে বের হয়ে পুনরায় P700-এ ফিরে এসেছে। PS-II এবং NADP রিডাক্টেজ এ চক্রে অংশগ্রহণ করে নি। তবে থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থান করে।

(কেমিঅসমোটিক প্রক্রিয়ায়) একটি ATP তৈরি হয়। Cyt. f. হতে ইলেক্ট্রন প্লাস্টোসায়ানিন (PC)-এর মাধ্যমে P700-তে ফিরে আসে। আদি ব্যাক্টেরিয়াতে কেবল চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন ঘটে। [সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, শৈবাল ও **সবুজ উদ্ভিদে সাধারণত NADP-র সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে থাকে**। পানির সরবরাহ বন্ধ হলে অচক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে না, চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে। প্রয়োজন হলে উভয় প্রক্রিয়া একই সাথে চলতে পারে। কেবল চক্রীয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ATP দিয়ে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় শর্করা তৈরি সম্ভব নয়।] মেমব্রেনে PS-II উপস্থিত থাকে কিন্তু চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে না।

অচক্রীয় ও চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন	চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন
১. উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন	PS-II হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন পুনরায় PS-II তে ফিরে আসে না।	PS-I হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে পুনরায় PS-I এ ফিরে আসে।
২. ফটোসিস্টেম	PS-I ও PS-II উভয়ই অংশগ্রহণ করে।	কেবলমাত্র PS-I অংশগ্রহণ করে।
৩. পানির প্রয়োজন	পানির প্রয়োজন হয়। কারণ পানির ইলেকট্রন ও প্রোটন এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।	পানির প্রয়োজন হয় না।
৪. O_2 উৎপন্ন	পানির ভাঙনের ফলে O_2 উৎপন্ন হয় যা পরে বায়ুতে নির্গত হয়।	কোনো O_2 উৎপন্ন হয় না কারণ এ প্রক্রিয়ায় কোনো পানি ব্যবহৃত হয় না।
৫. NADP এর জারণ	এক অণু NADP বিজারিত হয়ে এক অণু $NADPH + H^+$ সৃষ্টি করে।	কোনো NADP বিজারিত হয় না।

(খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (Light independent phase) : কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পদ্ধতি।

আলোকনির্ভর অধ্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH + H^+ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 হতে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ অধ্যায়ে CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে বলে একে কার্বন বিজারণ অধ্যায় বলা হয়। **কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় কোনো আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না, তাই একে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বা অন্ধকার** অধ্যায়ও বলা হয়। তবে আলোর উপস্থিতিতেই কার্বন বিজারণ হয়ে থাকে। এর কারণ আলোর উপস্থিতিতে ATP ও NADPH + H^+ সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং স্টোম্যাটা খোলা থাকায় CO_2 ও O_2 বিনিময় সহজ হয়। **আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (বা কার্বন বিজারণ) এর বিক্রিয়াসমূহ ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে সংঘটিত হয়।** আলোক অধ্যায় সম্পন্ন না হলে আলোকনিরপেক্ষ অধ্যায় ঘটবে না। আবহমণ্ডলের CO_2 হতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরোপ্লাস্টে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির তিনটি স্বীকৃত পথ আছে; তা হলো– (১) **ক্যালভিন চক্র**, (২) **হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র** এবং (৩) **CAM (Crassulacean Acid Metabolism) প্রক্রিয়া**।

কোষে সংঘটিত মেটাবলিক বিক্রিয়াসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে যাকে বলা হয় **গতিপথ** (Pathway)। যে গতিপথ চক্রাকারে ঘটে থাকে তাকে চক্র (cycle) বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই ক্যালভিন চক্র অনুসরণ করে। এসব উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ, যেমন– আম, জাম, ধান, পাট।

(১) ক্যালভিন চক্র : C_3 চক্র (Calvin cycle : C_3 cycle) : ১৯৪৭–১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালভিন ও তাঁর সহযোগীরা (Melvin Calvin, 1911–1997, Benson & Bassham) **তেজস্ক্রিয় কার্বন** (^{14}C-কার্বনের আইসোটোপ) **ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে** (tracer technique) ***Chlorella* নামক এককোষী শৈবালে কার্বন বিজারণের যে চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন তা ক্যালভিন চক্র নামে পরিচিত**। এ বিশেষ অবদানের জন্য ক্যালভিন ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র নিম্নরূপ :

(ক) কার্বন যোগ (কার্বোক্সিলেশন) :

১। **বায়ুস্থ CO_2** (এক কার্বনবিশিষ্ট) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে প্রবেশ করে তথায় পূর্ব থেকে অবস্থিত ৫-কার্বনবিশিষ্ট **রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট** (RuBP)-এর সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে ৬-কার্বনবিশিষ্ট সম্পূর্ণ অস্থায়ী কিটো অ্যাসিড (২-কার্বোক্সি ও কিটো অ্যারাবিনিটল ১,৫ বিসফসফেট)। কাজেই ক্যালভিন চক্রে CO_2-এর গ্রহীতা হলো RuBP.। **রুবিস্কো** (rubisco) **এনজাইম** CO_2-কে RuBP এর সাথে যুক্ত করতে সাহায্য। [পৃথিবীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম হলো রুবিস্কো কারণ এটি প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীবজগতের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। **রুবিস্কো** হলো 'রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ/ অক্সিজিনেজ এনজাইমের অ্যাক্রোনিম (acronym)]। এ এনজাইমের সাহায্যে পৃথিবীতে **প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন টন CO_2 কার্বোহাইড্রেট-এ রূপান্তরিত হয়।** পাতার মোট প্রোটিনের ৫০ ভাগ বা তারও অধিক হলো রুবিস্কো এনজাইম। রুবিস্কো পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান, প্রায় ৪০ মিলিয়ন টন।]

২। ৬ কার্বনবিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো অ্যাসিড এক অণু H_2O গ্রহণ করে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সাথে সাথেই দু অণু **3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** (3PGA) উৎপন্ন করে। **3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ। ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বনবিশিষ্ট বলে এ চক্রকে C_3 চক্রও বলা হয়। যেসব উদ্ভিদে C_3 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_3 উদ্ভিদ বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ, যেমন– আম, জাম, ধান, পাট।**

CO_2 এক কার্বনবিশিষ্ট, আর গ্লুকোজ ৬ কার্বনবিশিষ্ট, তাই এক অণু গ্লুকোজ তৈরি করতে হলে ৬ বার CO_2 যুক্ত হতে হবে অর্থাৎ চক্রটি ৬ বার সম্পন্ন হতে হবে।

[৬ চক্রে ১২ অণু 3PGA তৈরি হয়।]

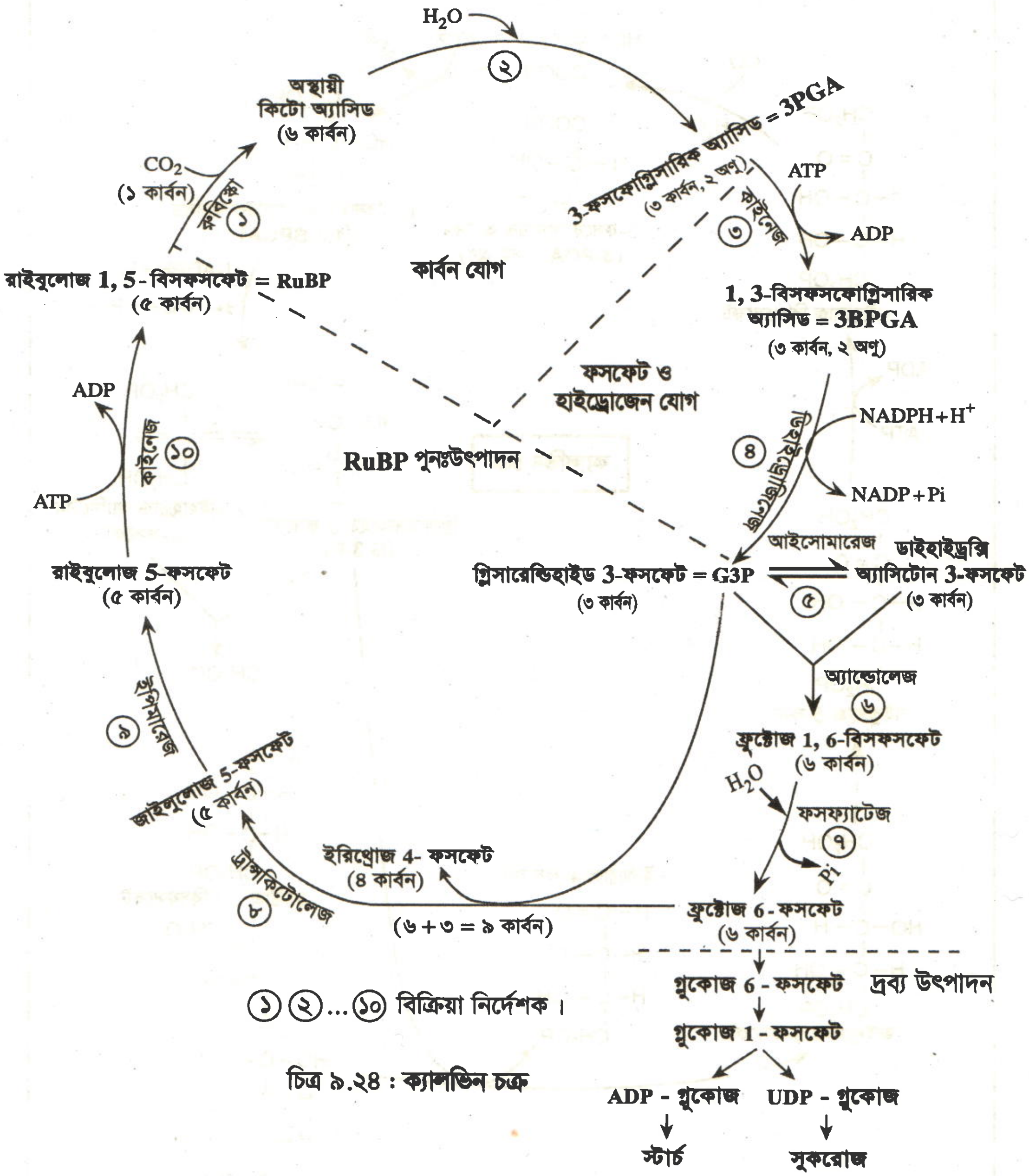

চিত্র ৯.২৪ : ক্যালভিন চক্র

(খ) ফসফেট যোগ (ফসফোরাইলেশন)

৩। ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রহণ করে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ (BPGA) পরিণত হয়। এখানে একটি ATP খরচ হয় এবং ১টি ADP মুক্ত হয়। এখানে **3-ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইম** বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে থাকে।

[১২ অণু 3PGA থেকে ১২ অণু BPGA তৈরি হয়; ১২টি ATP খরচ হয়, ১২টি ADP মুক্ত হয়।]

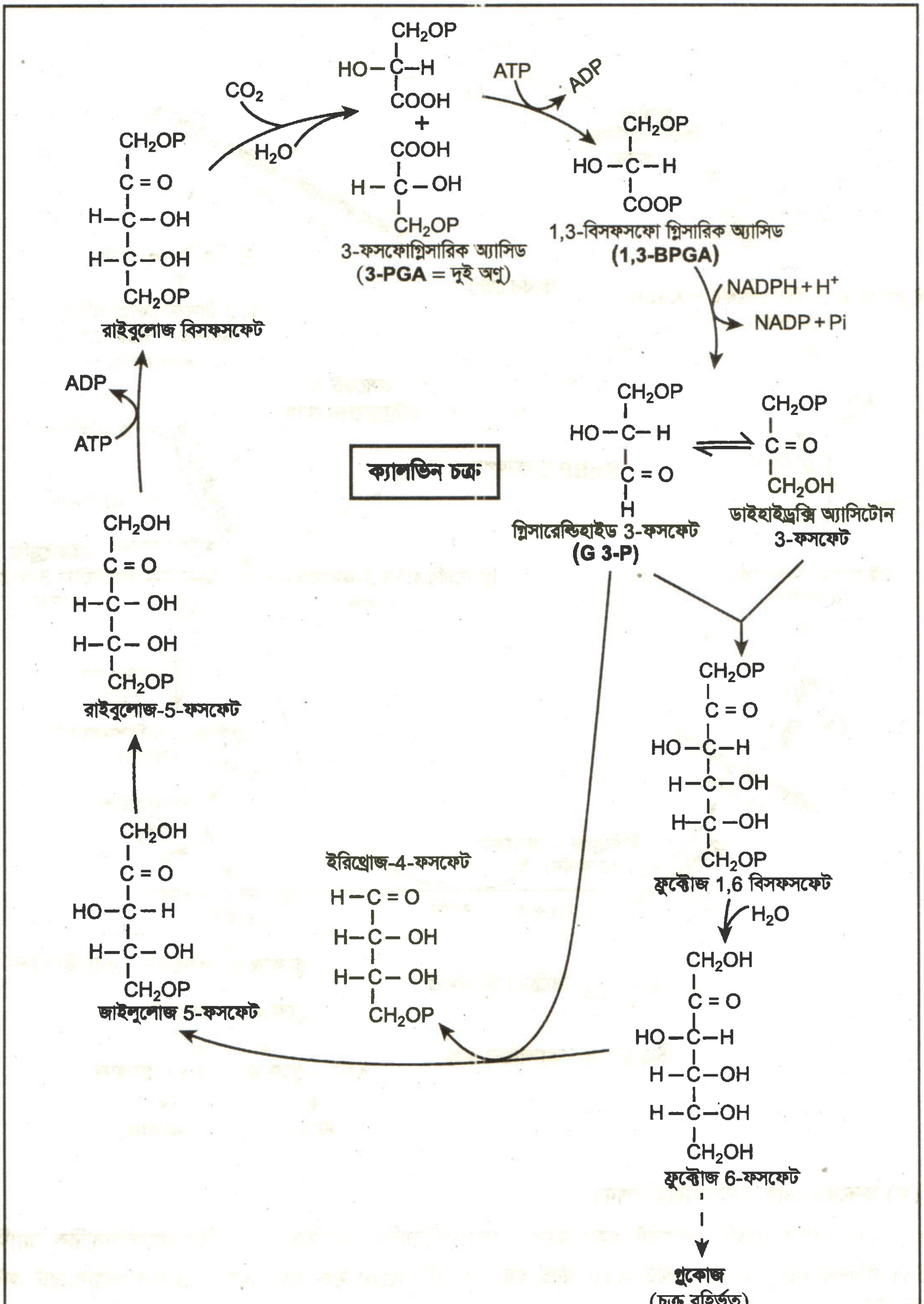

শিক্ষক এবং অগ্রসর শিক্ষার্থীর জন্য, মুখস্থ করার দরকার নাই।

(গ) হাইড্রোজেন যোগ (রিডাকশন)

৪। 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে **গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট**-এ (G3P) পরিণত হয়। এখানে একটি ফসফেট হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। $NADPH + H^+$ বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং NADP হিসেবে মুক্ত হয়। **গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম** এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। G3P একটি ৩-কার্বনবিশিষ্ট **কার্বোহাইড্রেট**।

[১২ অণু BPGA থেকে ১২ অণু G3P তৈরি হয়; ১২টি $NADPH + H^+$ অংশ গ্রহণ করে, ১২টি NADP ও ১২টি Pi মুক্ত হয়।]

ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন প্রথম চিনি (কার্বোহাইড্রেট) হলো G3P. G3P হতে পরবর্তী বিক্রিয়ার মাধ্যমে RuBP পুনঃউৎপন্ন করে চক্রটি চালু রাখে এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন করে সকল জীবের খাবার, শরীর গঠন ও শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করে। এক অণু গ্লুকোজ তৈরি করতে ১৮টি ATP ও ১২টি $NADPH + H^+$ দরকার হয়, শক্তি খরচ হয় ৬৮৬ Kcal ।

(ঘ) RuBP পুনঃউৎপাদন এবং দ্রব্য উৎপাদন

১২টি G3P তে (১২ × ৩ = ৩৬) ৩৬টি কার্বন আছে। এর মধ্যে **১০টি G3P** (৩০টি কার্বন) বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ৬টি ৫-কার্বনবিশিষ্ট (৫ × ৬ = ৩০) RuBP পুনঃউৎপাদন করে। **২টি G3P** হতে (৩ × ২ = ৬ কার্বন) **বিভিন্ন বিক্রিয়া শেষে ১ অণু গ্লুকোজ সৃষ্টি হয় এবং গ্লুকোজ থেকে পরে সুকরোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ (যা কোষ, টিস্যু ও অঙ্গ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অথবা জমা হয়)** ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করে। অন্য বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় এ সরল চিনি থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, লিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

[উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য চক্রটি এখানে শেষ করা যায় অথবা অগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য পরবর্তী স্টেপগুলো বর্ণনা করা যায়।]

৫। এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট, **ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ** এনজাইমের সহায়তায় এক অণু **ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট**-এ পরিণত হয়।

৬। এক অণু ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট এবং এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট মিলিতভাবে সৃষ্টি করে এক অণু **ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট**। **অ্যাল্ডোলেজ এনজাইম** এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৭। ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট এক অণু পানি গ্রহণ করে সৃষ্টি করে **ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট**। এখানে এক অণু ফসফেট মুক্ত হয়। **ফসফ্যাটেজ** এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৮। ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেটের সাথে মিলিতভাবে (৬+৩ = ৯ কার্বন) সৃষ্টি করে এক অণু **জাইলুলোজ 5-ফসফেট** (৫ কার্বন) এবং এক অণু **ইরিথ্রোজ 4-ফসফেট** (৪ কার্বন)। **ট্রান্সকিটোলেজ** এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। ইরিথ্রোজ 4-ফসফেট আরো কয়েকটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে এ চক্রের পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯। জাইলুলোজ 5-ফসফেট **ইপিমারেজ** এনজাইমের সহায়তায় **রাইবুলোজ 5-ফসফেট**-এ পরিণত হয়।

১০। রাইবুলোজ 5-ফসফেট, **রাইবুলোজ 5-ফসফেট কাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় ATP থেকে এক অণু ফসফেট গ্রহণ করে **রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট** (RuBP) **পুনঃউৎপাদন** করে। এখানে এক অণু ADP মুক্ত হয়।

আলোকনির্ভর অধ্যায় ও আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	আলোকনির্ভর অধ্যায়	আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়
১। যেখানে সংঘটিত হয়	ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ঘটে।	ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমার মধ্যে ঘটে।
২। আলোকশক্তি	আলোকশক্তির প্রয়োজন হয়।	আলোকশক্তির প্রয়োজন হয় না।
৩। যা ঘটে	আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও $NADPH + H^+$ উৎপন্ন হয়।	CO_2 থেকে শর্করা উৎপন্ন হওয়ার জন্য ATP ও $NADPH + H^+$ থেকে শক্তি সরবরাহ হয়।
৪। NADP	এ অধ্যায়ে NADP বিজারিত হয়।	এ অধ্যায়ে বিজারিত NADP জারিত হয়।
৫। বিশেষ নাম	ফটোফসফোলরাইলেশন (সূর্যালোকের শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়া)	কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পদ্ধতি।

C_3 (ক্যালভিন চক্র) উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের সার সংক্ষেপ

সালোকসংশ্লেষণের পর্যায়	স্থান	অন্তর্ভুক্তি	উৎপাদন
আলোকনির্ভর পর্যায়	ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেন PS-I (P700) PS-II (P680)	(i) আলোর ফোটন (ii) H_2O	(i) $NADPH + H^+$ (ii) ATP (iii) O_2
আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়	ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা	(i) 6 CO_2 (ii) 18 ATP (iii) 12 $NADPH + H^+$	(i) গ্লুকোজ (১ অণু) (ii) পুনঃউৎপাদন 6RuBP

আলোকনির্ভর পর্যায়ে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় সমান সংখ্যক ATP ও $NADPH + H^+$ উৎপন্ন হয় কিন্তু ক্যালভিন চক্রে ATP খরচ হয় ৬-অণু বেশি। উদ্ভিদ এ অতিরিক্ত ATP চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করে নেয়।

ক্যালভিন চক্রের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যালভিন চক্রের বিস্তারিত বিক্রিয়াসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল। ক্যালভিন চক্রের মূল বিষয় হলো—

(i) 6RuBP এর সাথে $6CO_2$ সংযুক্তিকরণ এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ 3PGA (3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড) তৈরি (১২ অণু)।

(ii) প্রথম কার্বোহাইড্রেট 3-কার্বনবিশিষ্ট G3P (গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট) তৈরি (১২ অণু)।

(iii) ৬ অণু RuBP পুনঃউৎপাদন ও চক্রের বাইরে ১ অণু গ্লুকোজ তৈরি। **ফটোসিনথেসিস এর মূল উদ্দেশ্যেই গ্লুকোজ তৈরি।**

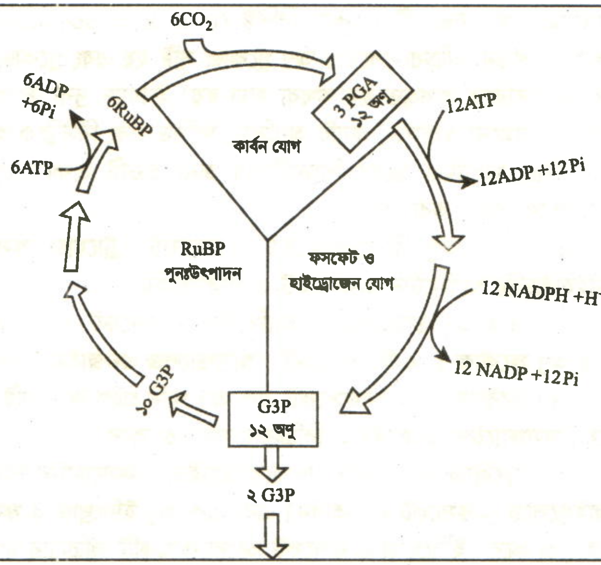

C_3 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য :

যেসব উদ্ভিদের ক্যালভিন চক্র ঘটে এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থরূপে ৩-কার্বনবিশিষ্ট ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA) উৎপন্ন হয়, সেসব উদ্ভিদকে C_3 উদ্ভিদ বলে। আর এ চক্রকে C_3 চক্র বলে।

যে সকল শৈবাল, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস ও নগ্নবীজী উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার সবগুলোতেই C_3 চক্র পাওয়া গেছে। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে, বিশেষ করে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে C_3 চক্র বিদ্যমান। বেশ কিছু একবীজপত্রী উদ্ভিদেও C_3 চক্র লক্ষ্য করা যায়। C_3 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। C_3 উদ্ভিদের স্টোম্যাটা দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ থাকে।

২। C_3 উদ্ভিদের পাতায় বান্ডলসীথ ঘিরে মেসোফিল টিস্যুর কোনো পৃথক স্তর থাকে না অর্থাৎ **ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি** অনুপস্থিত।

৩। ক্লোরোপ্লাস্টে একই ধরনের গ্রানাম থাকে।

৪। C_3 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের জন্য তাপমাত্রা 10–25°C প্রয়োজন।

৫। বায়ুমণ্ডলে 20% এর বেশি O_2 থাকলে C_3 উদ্ভিদের কার্বন বিজারণ বাধাগ্রস্ত হয়।

৬। বাতাসে 50–150 ppm (Parts per million) CO_2 এর উপস্থিতিতে C_3 চক্র ভালো চলে।
৭। C_3 উদ্ভিদে রাইবুলোজ-১, ৫-বিসফসফেট প্রথম CO_2 গ্রহণ করে।
৮। এদের শর্করা উৎপাদনক্ষমতা প্রজাতিভেদে নিম্ন থেকে উচ্চ।
৯। C_3 উদ্ভিদে ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড।

স্টার্চ ও সুকরোজ উৎপাদন

স্টার্চ : সাইটোসোলে (Cytosol) অর্থোফসফেটের (Pi) ঘনত্ব কম থাকলে ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে স্টার্চ সংশ্লেষিত হয়। ট্রায়োজ ফসফেট গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট মিলিতভাবে এক অণু ৬-কার্বনবিশিষ্ট ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট তৈরি করে যা ক্রমান্বয়ে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 1-ফসফেট, ADP-গ্লুকোজ হয়ে **স্টার্চ-এ পরিণত হয়।**

সুকরোজ : সাইটোসোলে অর্থোফসফেটের ঘনত্ব বেশি থাকলে Pi-এর বিনিময়ে Pi-ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ট্রায়োজ ফসফেট ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে সাইটোসোলে চলে আসে এবং ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট, ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 1-ফসফেট, UDP গ্লুকোজ (UDP= ইউরিডিন ডাই-ফসফেট) হয়ে শেষ পর্যন্ত সুকরোজ হিসেবে জমা হয়। **সুকরোজ সারা উদ্ভিদদেহে ট্রান্সপোর্ট হয়।** স্টার্চ এবং সুকরোজ এ চক্রের উৎপাদন, এ চক্রে অংশগ্রহণকারী নয়।

***গ্লুকোজ, স্টার্চ, সুকরোজ এসব দ্রব্য উৎপাদন ক্যালভিন চক্রের বাইরে হয়। এরা চক্রের অংশ নয়।**

আলোকশ্বসন বা ফটোরেসপিরেশন (Photorespiration) : আলোর সাহায্যে O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করার প্রক্রিয়া হলো ফটোরেসপিরেশন। সবুজ উদ্ভিদে C_3 চক্র তথা ক্যালভিন চক্র চলাকালে পরিবেশে তীব্র আলো ও উচ্চতাপমাত্রা সৃষ্টি হলে ফটোসিনথেসিস না হয়ে ফটোরেসপিরেশন ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্টে CO_2 এর পরিমাণ কম এবং O_2 এর পরিমাণ বেশি হলেই ফটোরেসপিরেশন হয়। তীব্র আলো ও অধিক তাপমাত্রায় (৩০° সে. এর ওপর) গাছে পানি সংরক্ষণের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পাতার অভ্যন্তরে CO_2 গ্যাস সীমিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় RuBP, CO_2 এর পরিবর্তে O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে ২-কার্বনবিশিষ্ট **গ্লাইকোলেট** (glycolate) তৈরি করে। গ্লাইকোলেট ক্লোরোপ্লাস্ট ত্যাগ করে সাইটোপ্লাজম-এ এসে **পারঅক্সিসোম** (Peroxisome)-এ প্রবেশ করে। পারঅক্সিসোমে প্রবেশ করে গ্লাইকোলেট O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে কিছু দ্রব্য তৈরি করে যা মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিক্রিয়া শেষে CO_2 ত্যাগ করে। কাজেই ফটোরেসপিরেশন প্রক্রিয়ায় **ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিসোম** এবং **মাইটোকন্ড্রিয়া**– এ তিনটি অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে। ফটোরেসপিরেশন C_3 উদ্ভিদের ফটোসিনথেসিস হার ২৫% পর্যন্ত কমাতে পারে।

আলোকশ্বসন প্রক্রিয়া প্রকৃত শ্বসন নয় কেন? : আলোকশ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙ্গে CO_2 নির্গত হয় ও O_2 গৃহীত হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় কোনো ATP উৎপন্ন হয় না বলে এ প্রক্রিয়াকে প্রকৃত শ্বসন বলা যায় না।

আলোকশ্বসন বা ফটোরেসপিরেশন ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

ফটোরেসপিরেশন	শ্বসন
১. প্রক্রিয়াটি আলোকনির্ভর।	১. এটি আলোকনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া।
২. ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিসোম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে জড়িত।	২. মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে জড়িত।
৩. কোনো ATP ও NADPH উৎপন্ন হয় না।	৩. ATP ও NADPH উৎপন্ন হয়।
৪. ক্যালভিন চক্রের ওপর নির্ভরশীল।	৪. ক্যালভিন চক্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
৫. প্রধানত C_3 উদ্ভিদে ঘটে।	৫. সকল জীবের সজীব কোষে ঘটে।

(২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : C_4 চক্র (Hatch and Slack Cycle : C_4 cycle) : H.P. Kortschak ও তাঁর সহযোগীরা $^{14}CO_2$ প্রয়োগ করে ইক্ষু উদ্ভিদে এবং একই পদ্ধতি ব্যবহার করে Y. Karpilov ও তাঁর সহযোগীরা ভুট্টা (*Zea mays*) উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে ৪-কার্বনবিশিষ্ট ম্যালিক অ্যাসিড এবং অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে ৭০–৮০ ভাগ চিহ্নিত কার্বন দেখতে পান, অর্থাৎ গবেষণায় ব্যবহৃত $^{14}CO_2$ কোনো C_3 পদার্থ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে না বরং C_4 পদার্থ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেছে। **এটি ক্যালভিন চক্রের ব্যতিক্রম।** পরবর্তীতে M.D. Hatch ও C.R. Slack নামক দু'জন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী **ইক্ষু উদ্ভিদ** নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করে কার্বন বিজারণের এ ভিন্ন পথকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ ইক্ষু উদ্ভিদেই পূর্ণাঙ্গভাবে এ গতিপথ প্রথম আবিষ্কৃত হয়), যা পরে Hatch & Slack গতিপথ বা C_4 চক্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় (১৯৭০)। **ডাইকার্বোক্সিলিক চক্র** নামেও এটি পরিচিত। বর্তমানে ১৬টি গোত্রের বহু উদ্ভিদে এ গতিপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাতার মেসোফিল কোষ এবং বান্ডলসীথ কোষ সম্মিলিতভাবে এ গতিপথ সম্পন্ন করে। ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ এবং পাইরুভেট-অর্থোফসফেট ডাইকাইনেজ এনজাইম **মেসোফিল কোষে সীমাবদ্ধ** থাকে। ডিকার্বোক্সিলেজসমূহ এবং ক্যালভিন চক্রের সকল এনজাইম **বান্ডলসীথ কোষে সীমাবদ্ধ** থাকে।

নিম্নলিখিত পর্যায়ে এ গতিপথ (চক্র) সমাপ্ত হয় : [MAT 14-15]

১। **মেসোফিল কোষে অবস্থিত ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড (৩ কার্বন) এর সাথে বায়ুস্থ CO_2 (HCO_3^- হিসেবে অংশগ্রহণ করে) মিলিত হয়ে ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে।** কার্বোক্সিলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। [DAT 18-19]

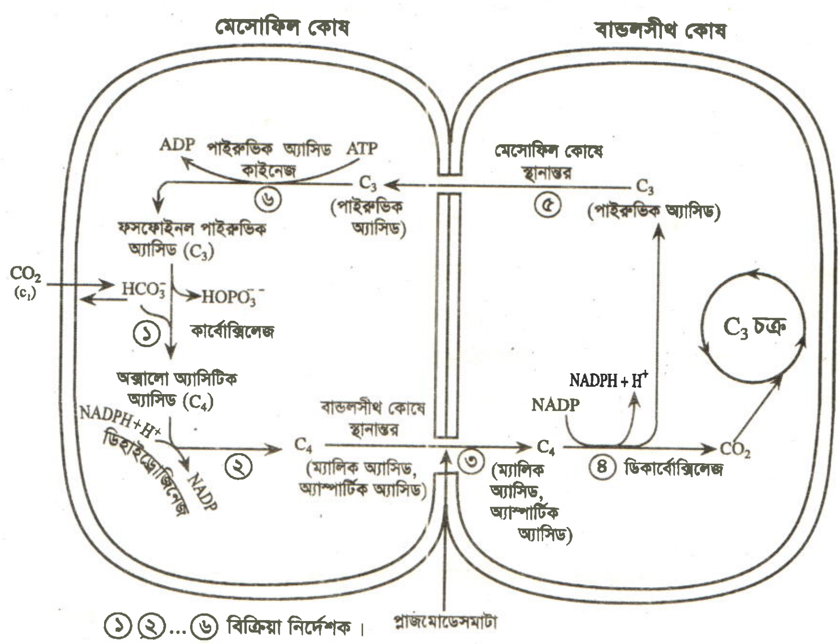

চিত্র ৯.২৫ : হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : একটি সাধারণ পথ পরিক্রমা।

২। অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড পরে **ম্যালিক অ্যাসিড** অথবা **অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড** (৪ কার্বন)-এ পরিণত হয়। ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। এখানে $NADPH + H^+$ যুক্ত হয়ে NADP তৈরি করে। **প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বনবিশিষ্ট বলে এ চক্রকে C_4 চক্র বলা হয়।** যেসব উদ্ভিদে C_4 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_4 উদ্ভিদ বলে।

৩। ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে বান্ডলসীথ কোষে প্রবেশ করে।

৪। বান্ডলসীথ কোষে ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 উৎপন্ন করে ৩-কার্বনবিশিষ্ট **পাইরুভিক অ্যাসিডে** পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় NADP অংশগ্রহণ করে এবং NADPH + H^+ তৈরি হয়। উৎপন্ন CO_2 সরাসরি C_3 চক্রে (ক্যালভিন চক্র) প্রবেশ করে (অর্থাৎ রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট কর্তৃক গৃহীত হয়) এবং চক্রটি এখানে সুসম্পন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় **ডিকার্বোক্সিলেজ** এনজাইম সহযোগিতা করে।

৫। পাইরুভিক অ্যাসিড বান্ডলসীথ কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে।

৬। পাইরুভিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষে **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইমের সহযোগিতায় ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড পুনঃউৎপাদন করে এবং চক্রটি চালু থাকে। এখানে একটি ATP থেকে একটি ADP তৈরি হয়।

বান্ডলসীথ কোষে CO_2 এর অভাব হয় না, তাই কোনো ফটোরেসপিরেশন হয় না, ফলে কার্বন বিজারণ হার অধিক হয়।

উদ্ভিদে তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায় : (i) বান্ডলসীথ কোষে স্থানান্তরিত C_4 অ্যাসিডের ধরন, (ii) মেসোফিল কোষে স্থানান্তরিত C_3 অ্যাসিডের ধরন এবং (iii) বান্ডলসীথ কোষে ডিকার্বোক্সিলেশন এনজাইমের প্রকার—এ তিন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায়। যথা :

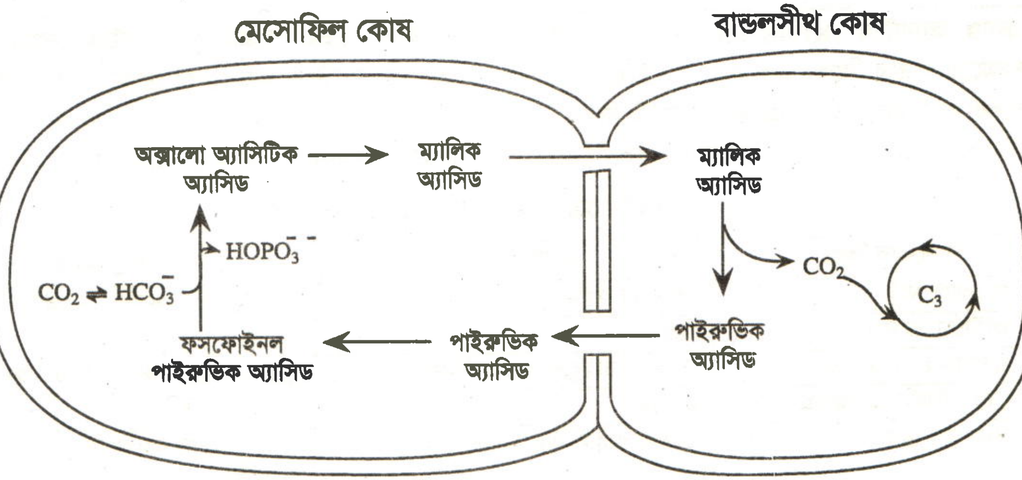

চিত্র ৯.২৬ : C_4 গতিপথ : NADP-malic enzyme প্রকার
ইক্ষু, ভুট্টা, সরগাম উদ্ভিদে এ চক্র পরিচালিত হয়।

(A) NADP-malic enzyme প্রকার।
ভুট্টা, ইক্ষু, সরগাম, ক্র্যাব ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী (৯.২৬ নং চিত্রে দেখানো হলো)।

(B) NAD-malic enzyme প্রকার। মিল্ল্যাত, কাউন, চিনা ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী।

(C) Phosphoenolpyruvate carboxykinase প্রকার। গিনি ঘাসে (Guinea grass) এ প্রকার কার্যকরী।

বি. দ্র. আমাদের দেশে ওপরে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলো ছাড়া বাকি অধিকাংশ উদ্ভিদই (ধান, পাট, আম, জাম, কলা, লিচু ইত্যাদি) C_3 উদ্ভিদ। ধানকে C_4 করার জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে।

C_3 উদ্ভিদ ও C_4 উদ্ভিদ এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ
১। তাপমাত্রা	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম নয়।	উচ্চতাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম।
২। ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না।	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের ঘন স্তর বিদ্যমান (ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি)।
৩। ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম।	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দু' রকম : (i) গ্রানাযুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং (ii) গ্রানাবিহীন বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট।
৪। CO_2 এর ঘনত্ব	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ৫০ ppm (parts per million) প্রয়োজন (৫০–১৫০ ppm)।	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ০.১০ ppm প্রয়োজন (০.১০–১০ ppm)।
৫। বিক্রিয়া	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ কোষে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।
৬। উৎপত্তি	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_3 উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে।	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_4 উদ্ভিদ উষ্ণমণ্ডলে উৎপত্তি লাভ করেছে।
৭। সালোকসংশ্লেষণ হার	এসব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার কম।	এসব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার বেশি।
৮। O_2 এর উপস্থিতি	স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে 1% বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।	অতিরিক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না।
৯। উদাহরণ	ধান, গম, বার্লি, আম, জাম, কাঁঠালসহ ৮৫% উদ্ভিদ।	গিনি ঘাস, ইক্ষু, ভুট্টা, মুথা ঘাস ইত্যাদি। [DAT 21-22]

ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি (Krans anatomy) : ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি হলো উচ্চতাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য C_4 উদ্ভিদসমূহের পাতার বিশেষ অন্তর্গঠন। C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথের চারদিকে ক্ষুদ্র ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত মেসোফিল টিস্যুর যে বিশেষ বলয় থাকে তাকে **ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি** বলে। এরা উদ্ভিদকে অল্প পরিমাণ CO_2-এর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এর মেসোফিল টিস্যুতে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ টিস্যুতে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ-স্ল্যাক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ক্যালভিন চক্র	হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র
১. যে কোষে ঘটে	কেবল মেসোফিল কোষে হয়।	মেসোফিল ও বান্ডলসীথ কোষে হয়।
২. ফটোরেসপিরেশন	ঘটে।	ঘটে না।
৩. প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা	RuBP (রাইবুলোজ ১-৫ বিসফসফেট)।	PEP (ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড)
৪. CO_2 ফিকসিং এনজাইম	রুবিস্কো।	PEP-কার্বোক্সিলেজ।
৫. প্রথম স্থায়ী দ্রব্য	৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড [PGA] (৩-কার্বন)।	অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড [OAA] (৪-কার্বন)।
৬. CO_2 এর জন্য কার্বোক্সিলেজ এর দক্ষতা	মধ্যম।	উচ্চ।
৭. ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন	একই রকম।	ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন দু'রকম : বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট।
৮. আদর্শ তাপমাত্রা	১০° সে. থেকে ২৫° সে.।	৩০° সে. থেকে ৪৫° সে.।
৯. CO_2 এর ঘনত্ব	বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm CO_2 থাকা প্রয়োজন।	বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ০.১০ ppm CO_2 থাকলেও চলে।

C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

যেসব উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হিসেবে ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় (হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রে) সেসব উদ্ভিদকে C_4 উদ্ভিদ বলে। আর এ চক্রকে C_4 চক্র বলে।

১। C_4 উদ্ভিদ প্রচণ্ড আলোতে অর্থাৎ 30–45°C তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে বেশি জন্মায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের একবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং বেশ কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদেও C_4 চক্র দেখা যায়।

২। C_4 উদ্ভিদ উচ্চতাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৩। এরা পানির অপচয় কম করে এবং শুষ্ক অঞ্চলেও অভিযোজিত।

৪। বান্ডলসীথ কোষ ও মেসোফিল কোষে অনেক প্লাজমোডেজমাটা থাকে।

৫। C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

৬। বান্ডলসীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

৭। বান্ডলসীথের মাঝে যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়, তাতে গ্রানা অনুপস্থিত কিন্তু মেসোফিল কোষে উন্নত প্রকৃতির গ্রানা বিদ্যমান। যেমন— ইক্ষু উদ্ভিদের পাতা।

৮। C_4 উদ্ভিদের মেসোফিল কোষে রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতা অনুপস্থিত।

৯। NADP ম্যালিক অ্যাসিড এনজাইমের উপস্থিতিতে বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে C_3 চক্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তি $NADPH + H^+$ উৎপাদিত হয়।

১০। বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে প্রচুর স্টার্চ দানা থাকে কিন্তু মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্টে স্টার্চ দানা থাকে না।

১১। রুবিস্কো এনজাইম মেসোফিলে থাকে না, বান্ডলসীথে অবস্থান করে।

১২। C_4 উদ্ভিদে আলোকশ্বসন প্রায় অনুপস্থিত এবং সহজে শনাক্ত করা যায় না। তাই সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত শর্করার অপচয় কম হয়।

C_4 উদ্ভিদ চক্রের গুরুত্ব

১। C_4 উদ্ভিদে উচ্চতাপমাত্রায় (30° C – 45° C) সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হতে পারে, তাই উচ্চতাপমাত্রায় এরা কর্মক্ষম থাকে।

২। C_4 উদ্ভিদের CO_2 গ্রাহক ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড, C_3 উদ্ভিদের CO_2 গ্রাহক রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট অপেক্ষা অধিক কার্যকর থাকে।

৩। মরু উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র আংশিকভাবে বন্ধ থাকলেও C_4 গতিপথ চালু থাকে।

৪। CO_2 এর অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বে C_4 গতিপথ চলতে পারে, তাই CO_2 কমের জন্য কার্বন বিজারণ বন্ধ হয় না।

৫। C_4 উদ্ভিদে প্রস্বেদন ও ফটোরেসপিরেশন কম হয় বলে CO_2 এর বিজারণ বেশি হয়।

৬। C_4 উদ্ভিদের পাতায় **Kranz অ্যানাটমির** জন্য এর খাদ্য উৎপাদনক্ষমতা বেশি ও অতি সহজভাবে এটি পরিবাহিত হতে পারে।

CAM প্রক্রিয়া

ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম সংক্ষেপে **CAM** প্রক্রিয়া বলা হয়। Crassulaceae গোত্রের (পাথরকুচি গোত্র) উদ্ভিদে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় বলে একে CAM নামকরণ করা হয়েছে। এসব উদ্ভিদ উষ্ণ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে। এসব উদ্ভিদে রাতে পত্ররন্ধ্রগুলো খোলা থাকে। এর কারণ দিনের বেলায় এদের পাতায় জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায় যার ফলে pH এর মাত্রাও কমে যায় এবং রাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় যার ফলে pH এর মাত্রা বেড়ে যায়। এ প্রক্রিয়ার বিক্রিয়ার ধাপগুলো C_4 বিক্রিয়ার মতোই।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন (O_2)-এর উৎস : সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

এতে দেখা যায়, এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে ৬ অণু O_2 নির্গত হয়। বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে CO_2 ও H_2O। অতএব, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের দুটি উৎস হতে পারে– একটি হলো CO_2 এবং

অপরটি হলো H_2O। নিম্নবর্ণিত পরীক্ষাগুলো হতে এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সালোকসংশ্লেষণের সময় যে O_2 নির্গত হয় তা H_2O হতে আসে, CO_2 হতে নয়, অর্থাৎ **সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো পানি (H_2O)। পরীক্ষাগুলো নিম্নরূপ :**

(i) হিল বিক্রিয়া : ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ রবিন হিল (Robin Hill) একটি পরীক্ষা করেন। তিনি CO_2 এর অনুপস্থিতিতে পৃথককৃত ক্লোরোপ্লাস্ট, পানি ও কিছু অজৈব জারক তথা হাইড্রোজেন গ্রাহক (hydrogen acceptor) একত্রে আলোতে রাখেন। পরীক্ষা শেষে দেখা যায় CO_2-এর অনুপস্থিতিতে কোনো শর্করা তৈরি হয় না, কিন্তু অক্সিজেন নির্গত হয়। আসলে পানির হাইড্রোজেন অজৈব জারক তথা হাইড্রোজেন গ্রাহককে বিজারিত (reduced) করে এবং অক্সিজেন বের হয়ে আসে। হিলের এ পরীক্ষা হতে প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো পানি, সেই বিক্রিয়াটিই হলো হিল বিক্রিয়া। হিল বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$2A\ (\text{অজৈব জারক}) + 2H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2AH_2 + O_2\uparrow$$

(ii) ভ্যান নীল (Van Niel)-এর পরীক্ষা : ভ্যান নীল সালোকসংশ্লেষণকারী সালফার ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখান যে, সালফার ব্যাক্টেরিয়া পানির পরিবর্তে H_2S গ্যাস ও CO_2 ব্যবহার করে শর্করা ও পানি উৎপন্ন করে। কিন্তু সেখানে কোনো অক্সিজেন নির্গত হয় না। তবে সালফার অণু নির্গত হয়। কাজেই এখানেও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি; CO_2 নয়।

$$2H_2S + CO_2 \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2S + (CH_2O) + H_2O$$

(iii) রুবেন ও কামেন-এর তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যামুয়েল রুবেন ও কামেন তেজস্ক্রিয় $O_2{}^{18}$ (অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ) দ্বারা পানির অক্সিজেনকে চিহ্নিত করেন এবং ঐ পানিতে কতগুলো শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ রেখে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলাফল লক্ষ্য করেন।

$$6CO_2 + 12H_2O^{18} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2^{18}$$

দেখা গেল যে, নির্গত অক্সিজেন তেজস্ক্রিয়। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি। একই পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর অক্সিজেনকে $O_2{}^{18}$ দ্বারা চিহ্নিত করেন এবং স্বাভাবিক পানি ব্যবহার করে একই পরীক্ষা করা হলো।

$$6CO_2^{18} + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6^{18} + 6H_2O^{18} + 6O_2$$

এবার দেখা গেল যে, শর্করা ও পানিতে তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন বিদ্যমান। কিন্তু সালোকসংশ্লেষণের ফলে নির্গত অক্সিজেন মোটেও তেজস্ক্রিয় নয়। কাজেই এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত সবটুকু অক্সিজেনের উৎসই পানি। এর সামান্যতম অংশও কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে আসে না।

সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকসমূহ (Factors of Photosynthesis) : সালোকসংশ্লেষণ কতগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। প্রভাবকের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরিমাণের কম-বেশি সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও কম-বেশি করে থাকে। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ : বেশ কিছু বাহ্যিক প্রভাবক রয়েছে যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১। **আলো :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য প্রস্তুতকরণে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা সূর্যালোক হতে এসে থাকে। সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সূর্যালোকের প্রভাবেই পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণে অংশগ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়। আলোক বর্ণালির সাতটি রঙের মধ্যে লাল, কমলা, নীল ও বেগুনি অংশই সালোকসংশ্লেষণে বেশি ব্যবহৃত হয়।

আলোর পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পাতার অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়, তাই সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

২। **কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)** : কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারণের ফলেই হয়ে থাকে। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হতে CO_2 গ্রহণ করে থাকে। বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ শতকরা ০.০৪ ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত CO_2 ব্যবহার করতে পারে, তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়।

৩। **পানি** : কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো পানিও এ প্রক্রিয়ার একটি কাঁচামাল। পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারও কমে যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ কমে যেতে পারে। অপরপক্ষে পানির উপস্থিতিই রক্ষীকোষকে স্ফীত করে এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। ফলে CO_2 অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাজেই পানির পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে আসে। পানি ভেঙ্গে O_2 নির্গত হয় এবং $NADPH + H^+$ তৈরি হয়।

৪। **তাপমাত্রা** : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (0° সে.-এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চতাপমাত্রায় (৪৫° সে.-এর ওপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও উষ্ণ প্রস্রবণের নীলাভ-সবুজ শৈবালে ৭০° সে. তাপমাত্রায়ও এ প্রক্রিয়া চলতে পারে। তবে ৪৫° সে.-এর ওপরে তাপমাত্রা ওঠলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০° সে. তাপমাত্রার নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমে যায়। উদ্ভিদের বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে অপ্টিমাম তাপমাত্রা ২২° সে. হতে ৩৫° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫। **অক্সিজেন** : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই সালোকসংশ্লেষণের হার কিছুটা কমে যায়। আর ঘনত্ব কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়।

৬। **খনিজ পদার্থ** : ক্লোরোফিল তৈরির জন্য লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। মাটিতে এসব খনিজ পদার্থের অভাব হলে ক্লোরোফিল তৈরি কমে যায়, ফলে সালোকসংশ্লেষণ হারও কমে যায়।

৭। **বাইরে থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য** : কিছু শৈবাল বা অন্যান্য উদ্ভিদে বাইরে থেকে ভিটামিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যদি না পায় তাহলে সালোকসংশ্লেষণ হয় না। কারণ এরা এসব দ্রব্য নিজে তৈরি করতে পারে না। এদেরকে **photoauxotrophs** বলে।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ : কিছু অভ্যন্তরীণ প্রভাবক রয়েছে যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮। **পাতার বয়স** : পাতার বয়সও সালোকসংশ্লেষণে একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। একেবারে কচি পাতা এবং একেবারে বৃদ্ধ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। মাঝারি বয়সের পাতাই অধিক পরিমাণে সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৯। **পাতার অন্তর্গঠন** : পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতি বিশেষ করে মেসোফিল কোষের বিন্যাস ও প্রকৃতি, পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে।

১০। **ক্লোরোফিল** : ক্লোরোফিলই সূর্যালোকের শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কার্বন বিজারণে সাহায্য করে থাকে। কাজেই ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতিতে কিছুতেই এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে সালোকসংশ্লেষণ হয়ে থাকে।

১১। **শর্করার পরিমাণ** : পাতার অভ্যন্তরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

১২। **প্রোটোপ্লাজম** : প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ও ধরনের ওপর সালোকসংশ্লেষণের হার অনেকটা নির্ভরশীল।

১৩। **পটাসিয়াম** : পটাসিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ, সম্ভবত এ প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবে পটাসিয়াম কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খোলাতে K^+ ভূমিকা রাখে।

১৪। **এনজাইম** : বহু ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। কাজেই বিক্রিয়া সম্পন্নকারী প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপস্থিতি ও পরিমাণও সালোকসংশ্লেষণ হার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

লিমিটিং ফ্যাক্টর (Limiting Factor) বা সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর

বিভিন্ন পরিবেশমূলক ফ্যাক্টর, যথা-CO_2, আলো, তাপ, পানি, অক্সিজেন ইত্যাদি একত্রে সালোকসংশ্লেষণের হার প্রভাবিত করে। উপরিউক্ত ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর সালোকসংশ্লেষণের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা এককভাবে অন্যান্য ফ্যাক্টর থেকে পৃথক করা কঠিন কাজ। এতদসত্ত্বেও সালোকসংশ্লেষণের ওপর প্রভাব সম্পন্ন প্রতিটি ফ্যাক্টরের সর্বনিম্ন (minimum), উপযুক্ত (optimum) এবং সর্বোচ্চ (maximum) প্রভাব কি তার ওপর ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লিবিগ (Liebig, 1843) **'ল অব মিনিমাম'** (Law of minimum) প্রস্তাব করেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

যদি একটি শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়া একাধিক ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন ফ্যাক্টর (সর্বনিম্ন ফ্যাক্টর) **দ্বারাই শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রিত হবে যাকে লিমিটিং ফ্যাক্টর** বলে। ১৯০৫ সালে ব্ল্যাকম্যান (Blackman, 1905) 'ল অব মিনিমাম' (Law of minimum) এর ওপর ভিত্তি করে **'ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর সূত্র'** (Law of limiting factor) বা **'সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর সূত্র'** প্রস্তাব করেন। এ সূত্র অনুযায়ী যখন কোনো শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা (rapidity) কয়েকটি পৃথক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয় সেক্ষেত্রে নিম্নতমগতিসম্পন্ন ফ্যাক্টর দ্বারাই এ প্রক্রিয়ার গতি সীমাবদ্ধ হবে। ব্ল্যাকম্যানের ভাষায় "When a process is conditioned as to its rapidity by a number of seperate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor."

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা, আলোর তীব্রতা এবং CO_2 এর ঘনত্ব—এ তিনটি লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

লিমিটিং ফ্যাক্টরের নীতি অনুযায়ী সালোকসংশ্লেষণ যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র একটি ফ্যাক্টর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। সালোকসংশ্লেষণের হার ঐ নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের সমানুপাতিক (proportional) অর্থাৎ ফ্যাক্টরটির পরিমাণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হারও বাড়বে। কিন্তু এ ফ্যাক্টরটির পরিমাণ অপটিমাম মান (optimum value) থেকে অনেক বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হারের ওপর এর প্রভাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং এর স্থলে অন্য একটি ফ্যাক্টর সালোকসংশ্লেষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২/৩টি উদাহরণ দ্বারা এ নীতিটি বোঝানো যায়।

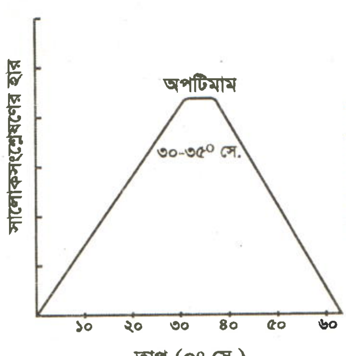

চিত্র ৯.২৭ : সালোকসংশ্লেষণের ওপর সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর হিসেবে তাপের প্রভাব

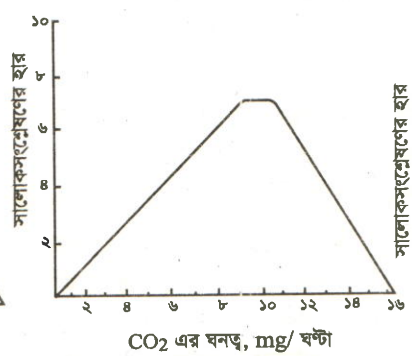

চিত্র ৯.২৮ : সালোকসংশ্লেষণের হারের ওপর CO_2-এর ঘনত্বের প্রভাব।

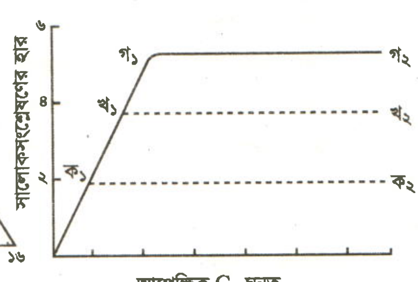

চিত্র ৯.২৯ : সালোকসংশ্লেষণের ওপর সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর হিসেবে আলোর তীর্যকতার প্রভাব।

30–35°C তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি। অতএব 30–35°C সালোকসংশ্লেষণের অপটিমাম তাপমাত্রা। তাপমাত্রা 0°C থেকে ধীরে ধীরে উচ্চতর তাপমাত্রায় উন্নীত করলে সালোকসংশ্লেষণের হার সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং 30–35°C তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি হয়। 35°C এর ওপরে তাপমাত্রা বাড়ানো হলে সালোকসংশ্লেষণের হার হঠাৎ এবং দ্রুত কমে যায় (চিত্র ৯.২৭)। এখানে তাপমাত্রা হলো লিমিটিং ফ্যাক্টর।

অনুরূপভাবে, CO_2 এর পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণকারী অপর একটি ফ্যাক্টর। যদি আলোকিত একটি পাতার ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রাম CO_2 ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকে কিন্তু ঐ পাতাকে ঘণ্টায় ১ মিলিগ্রাম CO_2সরবরাহ করা হয় তবে CO_2 লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। যদি CO_2 এর সরবরাহ ধীরে ধীরে ঘণ্টায় ১ হতে ২ মিলিগ্রাম, ২ হতে ৩ মিলিগ্রাম বাড়ানো হয় তবে সালোকসংশ্লেষণের হারও বাড়বে এবং এ বর্ধিত হার সর্বোচ্চ পর্যায় পৌছবে যখন ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রাম CO_2 সরবরাহ করা হয়। CO_2এর ঘনত্ব ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রামের ওপরে হলে সালোকসংশ্লেষণের হার হঠাৎ কমে যাবে। এখানে CO_2 হলো লিমিটিং ফ্যাক্টর (চিত্র ৯.২৮)।

নতুন একটি ফ্যাক্টর, ধরা যাক, আলো লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। আলোর তির্যকতা (intensity of light) দ্বিগুণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হার দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং একটি স্থির হারে (constant rate) সালোকসংশ্লেষণ চলতে থাকে (চিত্র ৯.২৯ খ$_১$-খ$_২$)। আলোর তির্যকতা তিনগুণ বাড়ালে সালোকসংশ্লেষণের হার আরও বাড়ে, **খ$_১$ হতে গ$_১$** এ উন্নীত হয় এবং **গ$_১$ হতে গ$_২$ লাইনে স্থিতিশীল হয়।**

সমুদ্র সমতলে CO_2 এর ঘনত্ব ৩০০ পিপিএম এবং উচ্চ দ্রাঘিমাংশে (high altitude) CO_2এর ঘনত্ব কমতে থাকে। গম গাছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি থাকে। জলজ উদ্ভিদে ১.১% CO_2 ঘনত্ব পর্যন্ত সালোকসংশ্লেষণের হার বাড়তে থাকে। স্টিম্যান নীলসনের (Steemann Nielsen, 1955) মতে *Chlorella* এবং *Scenedesmus*-এ CO_2-এর উচ্চ ঘনত্ব সহ্য করার ক্ষমতা উচ্চ উদ্ভিদের পাতা হতে বেশি। পাতায় বেশি CO_2সরবরাহ করলে পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— টমেটো উদ্ভিদে বেশি CO_2 সরবরাহ করলে পাতায় ন্যাক্রোটিক অঞ্চল (nacrotic area) সৃষ্টি হয়।

একটি সহজ উদাহরণ : রাত্রিতে **আলোর তীব্রতা** লিমিটিং ফ্যাক্টর, সকালে সূর্যের আলো শুরু হলে **তাপ** লিমিটিং ফ্যাক্টর এবং সূর্যের তাপ বাড়তে থাকলে **CO_2** এর ঘনত্ব লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

সালোকসংশ্লেষণের হার/কোশেন্ট (Photosynthetic Quotient-P.Q) : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে ও O_2 পরিত্যক্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় শোষিত CO_2 এর প্রায় সমপরিমাণ O_2 পরিত্যক্ত হয়। **নির্দিষ্ট সময়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 এবং CO_2 এর পরিমাণের অনুপাতকে সালোকসংশ্লেষণ হার** বলে। সংক্ষেপে একে P.Q বলে। সালোকসংশ্লেষণের হার নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়।

$$\text{সালোকসংশ্লেষণ হার (P.Q)} = \frac{O_2 \text{ ত্যাগের পরিমাণ}}{CO_2 \text{ গ্রহণের পরিমাণ}} = \frac{1}{1} = 1$$

এ সমীকরণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণে কী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয় তার ধারণা পাওয়া যায়। P.Q এর মান সব সময় 1 হয়। তবে কোনো কারণে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কম হয়। আবার CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে এর হারও বৃদ্ধি পায়।

আলো, তাপ, CO_2 ও ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ

আলো, তাপ, CO_2 এবং ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। **আলো :** আলোর ৩টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আলোর প্রকৃতি, তীব্রতা ও আলোকপ্রাপ্তির সময়কাল। আলোর প্রকৃতির মধ্যে কার্যকর বর্ণালি (action spectra) ও শোষণ বর্ণালি (absorption spectra) থেকে দেখা যায় যে, সালোকসংশ্লেষণে **লাল ও নীল আলো সর্বাধিক** সক্রিয়। কিন্তু শুধু এ দুটি আলো প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। আলোর তীব্রতা পরিবর্তন করে এ হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আলো ১০০ ফুট ক্যান্ডল হতে শুরু করে ৩০০০ ফুট ক্যান্ডল পর্যন্ত বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষণকে উন্নীত করা যায়। তীব্র সূর্যালোকে ১০,০০০–১২,০০০ ফুট পর্যন্ত ক্যান্ডল পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরিবেশে বা কাচের ঘরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব। আলোর সময়কাল, স্থান ও ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জানা গেছে, দীর্ঘ অবিরাম আলোর তুলনায় সবিরাম আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। কারণ, দিনের বেলায় অবিরাম আলোতে সংশ্লেষিত সমস্ত উপাদান আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ে একই হারে ব্যবহার করতে পারে না। দীর্ঘদিনের আলো ১৪–১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় পেলেও তা

সালোকসংশ্লেষণের কোনো কাজে লাগে না। অবিরাম আলো হলে ১০–১২ ঘণ্টায় সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব। ফলে দীর্ঘ বা ছোটো দিনে আলোকপ্রাপ্তি ও আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। তাপ : তাপ সালোকসংশ্লেষণের একটি প্রভাবক এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে সংশ্লেষণ হার কম-বেশি করা যায়। তাপ কম-বেশি করে আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ের ক্যালভিন চক্রকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণ অবস্থায় ১০°–৩০° সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় (৩০° সে. থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে)। সুতরাং কৃত্রিম পরিবেশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোক-সংশ্লেষণের হারকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩। CO_2 : বায়ুতে CO_2 এর পরিমাণ ০.০৩–০.০৪% পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। CO_2-এর পরিমাণ বাড়িয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করা যায়। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ০.৯–১% পর্যন্ত CO_2 সালোকসংশ্লেষণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। এ ক্ষমতা বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে; যেমন— ১.১% পর্যন্ত CO_2 এর পরিমাণ বায়ুতে বাড়িয়ে জলজ উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংশ্লেষণ হার পাওয়া গেছে, কিন্তু গম গাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংশ্লেষণ পাওয়া গেছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে। সুতরাং দেখা গেছে যে, পরিবেশে CO_2 ঘনত্বের পরিমাণ কম-বেশি করে এর হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিল সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। পাতায় ক্লোরোফিল-এর পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একে একটি প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক শিল্প বলা যেতে পারে। নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

১। **উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত** : এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ জীবনের মৌলিক চাহিদা মিটায়।

২। **প্রাণিকুলের খাদ্য** : প্রাণিজগৎ তার খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিজগতের সমুদয় খাদ্য উদ্ভিদজগৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ জগৎ এবং পরোক্ষভাবে মানুষসহ সমস্ত জীবজগৎ নির্ভরশীল।

৩। **শক্তির উৎস** : জীবজগতের শক্তির একমাত্র উৎস হলো সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। আমরা কাজ-কর্ম, চলাফেরা, দৌড়, কুস্তি ইত্যাদিতে যে শক্তি খরচ করি তা আসে খাদ্য হতে, আর খাদ্য তৈরির প্রাথমিক বা মূল প্রক্রিয়া হলো সালোকসংশ্লেষণ। কিন্তু খাদ্যে ঐ শক্তি কোথা হতে কীভাবে আসে? খাদ্যের মাঝে এ শক্তি আসে সূর্য হতে। সূর্যের এ শক্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে আটকা পড়ে। কাজেই জীবের সকল শক্তির উৎস এ প্রক্রিয়া।

৪। **জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালন** : উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রে বহু বিপাকীয় প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এসব বিক্রিয়া না ঘটলে কোনো জীবন টিকে থাকতে পারতো না। এসব বিপাকীয় প্রক্রিয়া পরিচালনার সকল শক্তি আসে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ হতে।

৫। **পরিবেশ পরিশোধন** : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 শোষিত হয় এবং O_2 উৎপন্ন হয়। প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকারক CO_2 শোষণ করে এবং সকল জীবের শ্বসনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় O_2 সরবরাহ করে এ প্রক্রিয়া পরিবেশ পরিশোধন করে থাকে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়া জীবজগতকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে।

৬। **উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি** : সবুজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শক্তি ও অন্যান্য উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই এসে থাকে।

৭। মানবসভ্যতায় অবদান : সালোকসংশ্লেষণ না থাকলে মানুষই থাকতো না। তবুও বর্তমান মানবসভ্যতায় এ প্রক্রিয়ার অবদান অসীম। মানবসভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, পেট্রোল, রেয়ন, সেলোফেন, ফিল্ম, কাগজ, রবার, কুইনাইন, মরফিন, রেসারপিন ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ারই ফল।

মোটকথা উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা সমগ্র জীবজগৎ তাদের খাদ্য, শক্তি ও জীবনসত্তার জন্য সম্পূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কাজেই এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য অপরিসীম ও তুলনাবিহীন।

সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কোথায় যায়?

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে শ্বেতসার বা স্টার্চ উৎপন্ন হয়। এটি একটি কঠিন পদার্থ। কাজেই উদ্ভিদ এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না, পাতায় তৈরি স্টার্চ প্রথমে গ্লুকোজ ও পরবর্তীতে সুকরোজ-এ পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চালিত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাইটোসোলে সুকরোজ উৎপন্ন হয়। সুকরোজ সরাসরি উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এর এক অংশ বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাড়তি অংশ সঞ্চয়ী অঞ্চলে ভবিষ্যতের জন্য জমা হয়। বিভিন্ন কাজ-কর্ম চালানোর জন্য শ্বসন প্রক্রিয়ায় তা ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এক অংশ অন্য প্রকার খাদ্য যথা চর্বি, আমিষ প্রভৃতি তৈরিতে কাজে লাগে।

ব্যবহারিক : সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের একটি সবুজ পাতা, বড়ো মুখওয়ালা একটি কাচের বোতল ও বোতলের ছিপি, কস্টিক পটাশ দ্রবণ, একটি পেট্রিডিস, অ্যালকোহল, আয়োডিন দ্রবণ, ভেসেলিন।

কার্য পদ্ধতি : প্রথমে কিছু পরিমাণ কস্টিক পটাশ দ্রবণ বোতলের ভেতরে রাখতে হবে। সবুজ পাতাটিকে (যা সূর্যোদয়ের পূর্বে সংগ্রহ করা) বোতলের ছিপির মাঝ বরাবর দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যেন পাতার বোঁটাসহ অর্ধেকটা ছিপির বাইরে থাকে, বাকি অর্ধেকটা বোতলের ভেতরে থাকে। এবার ভেসেলিন দিয়ে বোতলটাকে এমনভাবে বায়ুরোধক করতে হবে যেন কোনোক্রমেই বায়ু (এবং তার সাথে CO_2) ভেতরে যেতে না পারে। পাতার বোঁটা পানিভর্তি একটি পেট্রিডিসে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করতে পারে। এবার পরীক্ষণ সেটটিকে সূর্যালোকে রাখতে হবে। বিকেলে পাতাটিকে খুলে প্রথমে অ্যালকোহলে কতক্ষণ সিদ্ধ করতে হবে এবং পরে আয়োডিন দ্রবণে রাখতে হবে।

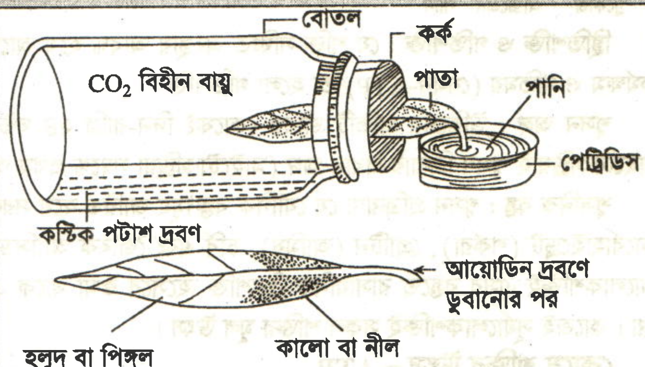

চিত্র ৯.৩০ : সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে পাতার যে অংশ ছিপির বাইরে ছিল সে অংশ নীল/ গাঢ় বেগুনি/ কালো বর্ণ ধারণ করেছে আর যে অংশ বোতলের ভেতরে ছিল তা হলুদ বা পিঙ্গল বর্ণপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ : পাতার বোতলের ভেতরের অংশ নীল/ গাঢ় বেগুনি/ কালো হয়নি, কারণ সে অংশে শ্বেতসার ছিল না অর্থাৎ শ্বেতসার তৈরি হয়নি। ভেসেলিন দ্বারা বোতলটিকে বায়ুরোধক করাতে বাইরে থেকে বোতলের ভেতরে বাতাস তথা CO_2 প্রবেশ করতে পারেনি, আবার বোতলের ভেতরকার বাতাসেও CO_2 ছিল না, কারণ বোতলের ভেতরকার কস্টিক পটাশ দ্রবণ পূর্বেই তা শোষণ করে নিয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত : বোতলের ভেতরে পাতার অংশ সূর্যালোক, পানি ও O_2 পেয়েছে, কেবল CO_2 পায়নি। কাজেই পাতার বোতলের ভেতরকার অংশে শ্বেতসার তৈরি না হওয়ার কারণ CO_2 এর অনুপস্থিতি, অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণের জন্য CO_2 অপরিহার্য।

৯.৪ : শ্বসন (Respiration)

[ল্যাটিন *Respirae* ,= to breathe, শ্বাস নেয়া]

সকল সজীব উদ্ভিদকোষে (এবং সকল সজীব প্রাণিকোষে) প্রতিনিয়ত অব্যাহতভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এসব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার জন্য চাই শক্তি। আর এ শক্তির উৎস হলো কোষস্থ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ। এর মধ্যে **কার্বোহাইড্রেটই হলো শক্তির প্রধান উৎস**। স্টার্চ, সুকরোজ বা গ্লুকোজ-এ যে স্থির শক্তি জমা থাকে তা একই সাথে সবটুকু মুক্ত হয় না, বরং বিভিন্ন এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কতিপয় পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মুক্ত হয়। এসব রাসায়নিক পদার্থের স্থিরশক্তি কর্মক্ষম গতিশক্তি হিসেবে মুক্ত করতে কোষে যেসব পর্যায়ক্রমিক জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এদেরকে সামগ্রিকভাবে একসাথে শ্বসন নামে অভিহিত করা হয়। কাজেই **শ্বসন হলো শক্তি নির্গমনকারী কতিপয় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমষ্টি**। শক্তি উৎপাদনকালে জটিল খাদ্যদ্রব্য সরল দ্রব্যে পরিণত হয়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ জটিল জৈবযৌগ (খাদ্যবস্তু) জারিত হয়, ফলে জৈবযৌগে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয়ে গতিশক্তি বা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়, তাকে শ্বসন বলে। শ্বসনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা জীবের বিভিন্ন শক্তি শোষণকারী কার্যকলাপে ব্যয় হয়। গ্লুকোজকে প্রাথমিক শ্বসনিক বস্তু ধরলে শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + 36\ ADP + 36\ Pi \xrightarrow[\text{কো-এনজাইম, ইত্যাদি}]{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\ ATP$$ (পূর্বে 38 ATP হিসেবে করা হতো)

স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি : যে শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে আছে (যেমন-খাদ্যদ্রব্যে) তা হলো স্থিতিশক্তি। যে শক্তি কর্মক্ষম ও গতিময় (যেমন-ATP) তা হলো গতিশক্তি।

শ্বসন অঙ্গ : উদ্ভিদের প্রতিটি জীবন্ত কোষেই দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা শ্বসনকার্য চলতে থাকে। কোষীয় **সাইটোপ্লাজম** ও **মাইটোকন্ড্রিয়াই** শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ (মাইটোকন্ড্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

শ্বসনিক বস্তু : শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক বস্তুসমূহ জারিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয় সেসব বস্তুকে শ্বসনিক বস্তু বলে। কার্বোহাইড্রেট (শর্করা), প্রোটিন (আমিষ), চর্বি এবং জৈবিক অ্যাসিডসমূহ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সূর্যালোকের আলোকশক্তিই এসব বস্তুতে রাসায়নিক স্থিরশক্তি হিসেবে জমা থাকে এবং শ্বসনের ফলে স্থিরশক্তি গতিশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। কাজেই **সূর্যালোকশক্তিই সকল শক্তির মূল উৎস**।

কোষে শক্তির উৎস = ATP

ATP তৈরি : ADP + Pi = ATP, ATP তৈরির জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। এ বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে জৈবযৌগ ভাঙ্গনের মাধ্যমে। **ATP কখনও এক কোষ থেকে অন্যকোষে স্থানান্তরিত হতে পারে না,** অথচ সকল কোষের জন্যই নিরবচ্ছিন্ন ATP সরবরাহ প্রয়োজন। এ কারণে প্রতিটি সজীব কোষেই শ্বসনের প্রয়োজন হয় যাতে করে প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে জীবনের সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। **জীবদেহের প্রতিটি কোষেই শ্বসন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে এ প্রকার শ্বসনের নাম কোষীয় শ্বসন** (Cellular respiration)।

তিনটি কারণে কোষের শক্তির প্রয়োজন হয় :

১। বড়ো জৈব অণু, যেমন DNA, RNA, প্রোটিন ইত্যাদি সংশ্লেষ করা।

২। সক্রিয় ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায় জৈব অণু বা আয়ন মেমব্রেনের মধ্যদিয়ে আদান-প্রদান করা।

৩। কোষের অভ্যন্তরে বস্তুসমূহকে (যেমন— ক্রোমোসোম, পেশিকোষে প্রোটিন তন্তু) এদিক-ওদিক পরিচালনা করা।

কোষের ভেতরে যখন ATP ব্যবহৃত হয় তখন এর সবটুকুই তাপ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। তাপ শক্তি কোষকে গরম রাখতে প্রয়োজন হলেও কোষের কোনো কার্যক্রমে পুনঃব্যবহৃত হতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত পরিবেশে হারিয়ে যায়।

শ্বসনের প্রকারভেদ : অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে শ্বসন প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : (ক) **সবাত শ্বসন** (Aerobic respiration) এবং (খ) **অবাত শ্বসন** (Anaerobic respiration)। যে শ্বসন ক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তাকে সবাত শ্বসন বলে এবং যে শ্বসন ক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

সবাত শ্বসনে অক্সিজেন শ্বসনিক বস্তুকে সম্পূর্ণ জারিত করে এবং অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করে। অবাত শ্বসনে কোষস্থ কতিপয় এনজাইম শ্বসনিক বস্তুকে আংশিক জারিত করে এবং স্বল্প শক্তি উৎপন্ন করে।

(ক) সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration)

যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে। অক্সিজেনের উপস্থিতি অর্থাৎ বায়ুর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় বলে এ প্রকার শ্বসনের নাম বাংলা ভাষায় করা হয়েছে সবাত (বাতাসসহ) শ্বসন। অধিকাংশ জীব-এর (বহু ব্যাকটেরিয়া, অধিকাংশ ছত্রাক, সকল প্রোটিস্ট, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর) শ্বসন হলো সবাত শ্বসন। সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ :

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + 36ADP + 36\,Pi \xrightarrow{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\,ATP$$ (পূর্বে 38 ATP হিসেবে করা হতো)

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায়সমূহ

সবাত শ্বসন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও বিক্রিয়ার স্থান ও কাজের ধারা অনুযায়ী একে একাধিক ধারাবাহিক ধাপ বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো নিম্নরূপ :

১। প্রথম ধাপ : গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) : স্থান- কোষের সাইটোপ্লাজম [DAT 20-21]

যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস (গ্রিক Glykos=Sugar এবং lysis = splitting) বলে। এ প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না। [MAT 21-22] [DAT 22-23] গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম বা অভিন্ন ধাপ। [গ্লাইকোলাইসিসকে EMP (এ প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনজন বিজ্ঞানী Embden, Meyerhof and Parnas এর নাম অনুযায়ী) পাথওয়ে, শ্বসনের সাধারণ গতিপথ বা **সাইটোপ্লাজমীয় শ্বসন**ও বলা হয়। উদ্ভিদে সঞ্চিত শ্বেতসার প্রথমে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় এবং গ্লুকোজ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার প্রথম বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধাপের সব এনজাইম দ্রবণীয়।]

গ্লুকোজকে **শ্বসনিক বস্তু** ধরলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

(i) **গ্লুকোজ,** ATP হতে একটি ফসফেট গ্রহণ করে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **হেক্সোকাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং একটি ADP সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

(ii) **গ্লুকোজ-৬-ফসফেট,** ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট-এ রূপান্তরিত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফো-গ্লুকোআইসোমারেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(iii) **ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট,** ATP হতে একটি ফসফেট গ্রহণ করে ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং একটি ADP সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

(iv) **ফ্রুক্টোজ-১-৬-বিসফসফেট** (৬ কার্বনবিশিষ্ট) ভেঙে **এক অণু ৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (৩ কার্বনবিশিষ্ট) এবং এক অণু ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট** (৩ কার্বনবিশিষ্ট) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় **অ্যালডোলেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। **আইসোমারেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। উভয় বিক্রিয়া দ্বিমুখী।

(v) **৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড** এক অণু অজৈব ফসফেট গ্রহণ করে ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়, অজৈব ফসফেট ও NAD অংশগ্রহণ করে এবং $NADH + H^+$ সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

সুক্রোজ হলো উদ্ভিদে প্রধান ট্রান্সলোকেটেড শ্যুগার, তাই সুক্রোজকেই উদ্ভিদে শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ধরা উচিত, গ্লুকোজকে নয়। HSC পর্যায়ের জন্য বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিল বলে গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো।

গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরে
গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ছক

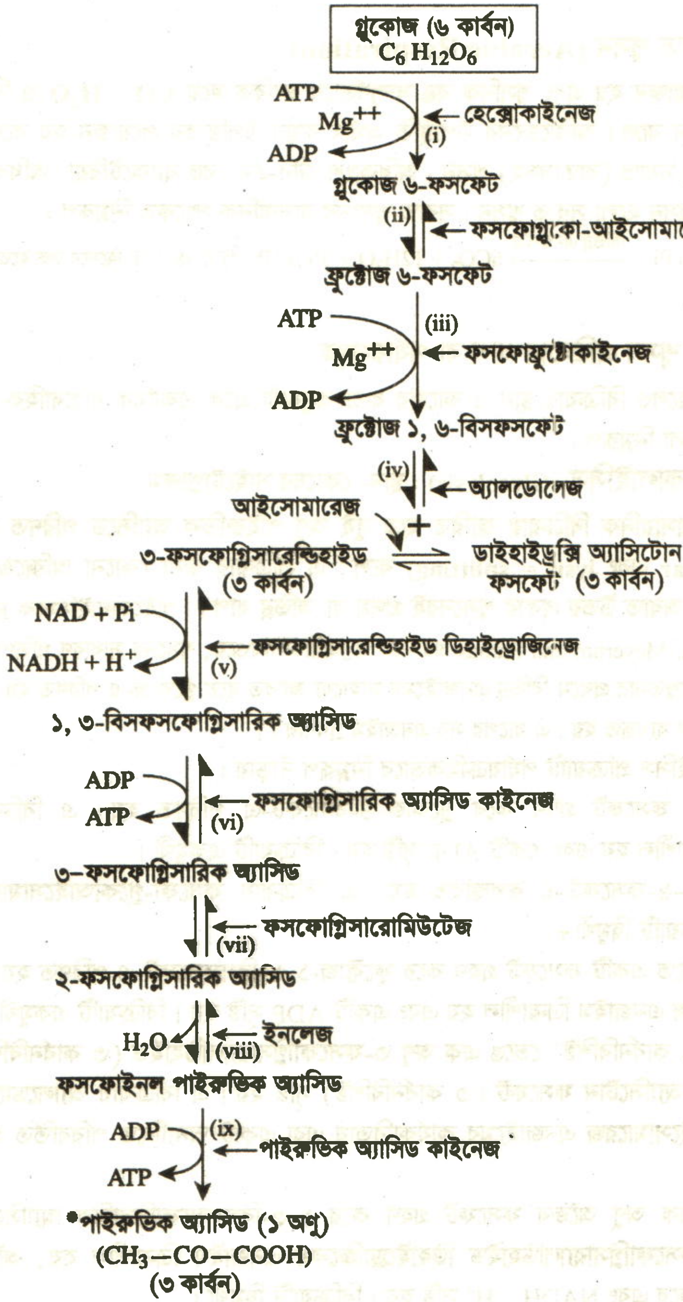

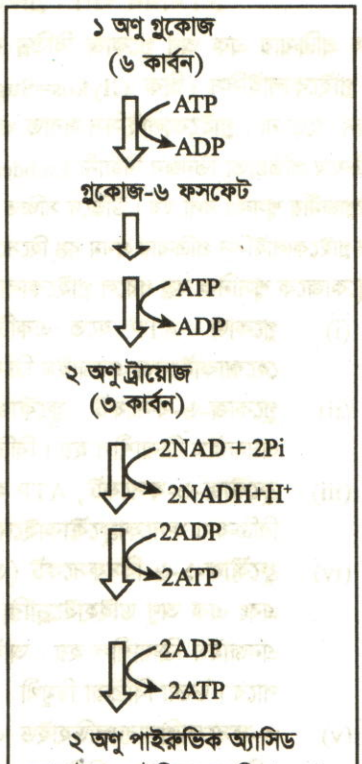

(গ্লাইকোলাইসিস : সংক্ষিপ্ত রূপ)

চিত্র ৯.৩১ : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার ছক।

---

*কোষের অভ্যন্তরে যে pH থাকে তাকে পাইরুভিক অ্যাসিড H^+ আয়ন এবং পাইরুভেট আয়ন হিসেবে অবস্থান করে, তাই পাইরুভিক অ্যাসিড না বলে বর্তমানে পাইরুভেট বলা হয়। একটি ট্রায়োজ হতে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে, অপরটি দেখানো হয় নি।

(vi) **১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক** অ্যাসিড, একটি ফসফেট হারিয়ে ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(vii) **৩-ফসফোগ্লিসারিক** অ্যাসিড, **ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায়, ২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(viii) **২-ফসফোগ্লিসারিক** অ্যাসিড, **ইনলেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায়, ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী। এখানে এক অণু পানি বের হয়ে যায়।

(ix) **ফসফোইনল পাইরুভিক** অ্যাসিড, **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায়, **পাইরুভিক** অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। গ্লুকোজ হতে পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টির মাধ্যমেই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়ার ৯টি বিক্রিয়ার মধ্যে ১ম, ৩য় এবং ৯ম তথা শেষ–এ ৩টি বিক্রিয়া একমুখী, অন্যগুলো দ্বিমুখী।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপাদন : ATP (দু' অণু), NADH + H^+ (দু' অণু) এবং পাইরুভিক অ্যাসিড (দু' অণু)। **ATP ও NADH + H^+ হলো শক্তি অণু।**

গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ-১, ৬-বিসফসফেট হওয়া পর্যন্ত দু' অণু ATP খরচ হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক ট্রায়োজ (৩-কার্বনবিশিষ্ট গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন) হতে পাইরুভিক অ্যাসিড হওয়া পর্যন্ত দু' অণু ATP এবং এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দু অণু ট্রায়োজ হতে মোট চারটি ATP এবং দুটি NADH + H^+ উৎপন্ন হয়। কাজেই দেখা যায় তৈরিকৃত ৪ অণু ATP হতে প্রথমে ব্যবহৃত দু' অণু ATP বাদ দিলে **গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় নিট দুটি ATP ও দুটি NADH + H^+ জমা হয়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে। এর সবকটি এনজাইম দ্রবণীয়।**

$NADH_2$ না লিখে NADH + H^+ লেখা হয় কেন? কারণ NAD^+ কে বিজারণের জন্য, বিজারণ অণু ২টি হাইড্রোজেন এটম ($2e^- + 2H^+$) প্রদান করে থাকে। NAD^+ অণুর মাথার রিং স্ট্রাকচার ২টি ইলেকট্রন ($2e^-$) এবং ১টি প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে, অপর প্রোটন (H^+) পৃথকভাবে সাইটোসোলে মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাই বিজারিত NAD কে $NADH_2$-এভাবে প্রকাশ না করে, NADH + H^+-এভাবে প্রকাশ করা হয়।

একই কারণে $NADP^+$ কে বিজারিত অবস্থায় NADPH + H^+ হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

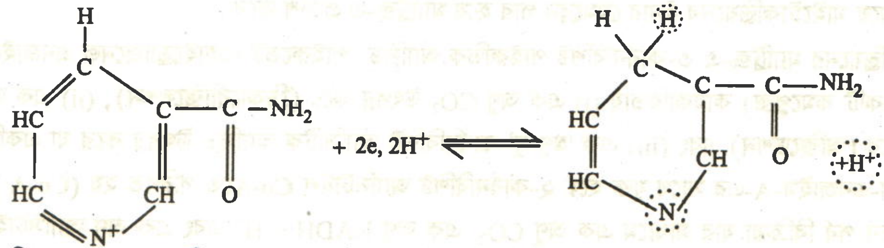

জারিত NAD-এর মাথার রিং   বিজারিত NAD-এর মাথার রিং (পরিবর্তন লক্ষ্য করুন)

গ্লাইকোলাইসিস-এর নিয়ন্ত্রণ

১। গ্লাইকোলাইসিস ত্বরান্বিত হয় ATP-এর ব্যবহার দ্রুত হলে, ATP-এর ব্যবহার হ্রাস পেলে প্রক্রিয়ার হার কমে যায়।

২। গ্লুকোজ-এর প্রাপ্তি তথা সরবরাহের পরিমাণ এ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। অ্যালোস্টেরিক এনজাইম 'ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ' যা ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ ১, ৬, বিসফসফেট তৈরি করতে সহায়তা করে, তার গতিময়তার ওপর গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভরশীল। ATP দ্বারা এর কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ADP দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বিপাক ক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। (১) গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন উপচিতিমূলক পথে বেশ কিছুসংখ্যক কোষীয় উপাদান সৃষ্টি করে। (২) গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত পৌঁছাতে যে ATP বা $NADH + H^+$ পাওয়া যায় তা মোট সুপ্তশক্তির মাত্র ১৭%। মাত্র ৩% শক্তি তাপশক্তি হিসেবে বেরিয়ে যায় এবং প্রায় ৮০% শক্তি পাইরুভিক অ্যাসিডের মধ্যে তখনও জমা থাকে। (৩) **পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টিই এ প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয়।** পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টি না হলে শ্বসন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। শ্বসন বন্ধ হলে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। পাইরুভিক অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে ভূমিকা রাখে। ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট স্নেহ পদার্থ বিপাকে ভূমিকা রাখে।

গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার উল্টো পথে গ্লুকোজ তৈরি হওয়াকে বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস। এটি প্রাণীর চেয়ে উদ্ভিদে কম হয়, তবে রেড়ি বীজ, সূর্যমুখী বীজ ইত্যাদিতে জমাকৃত তেল গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সুকরোজ বা গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় যা পরবর্তীতে বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

গ্লাইকোলাইসিস ও ফটোলাইসিস এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোলাইসিস	ফটোলাইসিস
১. সংঘটনের প্রক্রিয়া	শ্বসনকালে ঘটে।	সালোকসংশ্লেষণকালে ঘটে।
২. সংঘটনের স্থান	কোষের সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়।	ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানাম অঞ্চলে সম্পন্ন হয়।
৩. আলো	সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না।	সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়।
৪. উৎপন্ন দ্রব্য	এ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।	এ প্রক্রিয়ায় পানি থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।
৫. প্রক্রিয়ার নাম	এ প্রক্রিয়াকে EMP পথ বলে।	এ প্রক্রিয়াটি হিল বিক্রিয়া তুল্য।

২। দ্বিতীয় ধাপ : পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন বা অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি : স্থান- মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স

পাইরুভিক অ্যাসিডের মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ : পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয় কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং সাইটোপ্লাজম থেকে সরাসরি ছিদ্রপথে মাইটোকন্ড্রিয়নের বাইরের মেমব্রেন পার হয়। পরে ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে, OH^- আয়নের বিনিময়ে মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেন পার হয়ে ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করে।

মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স-এ ৩-কার্বনবিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিড, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের (একাধিক এনজাইমের একটি কমপ্লেক্স) কার্যকারিতায় (i) এক অণু CO_2 উৎপন্ন করে **(ডিকার্বোক্সিলেশন)**, (ii) এক অণু $NADH + H^+$ উৎপন্ন করে **(অক্সিডেশন)** এবং (iii) এক অণু দু' কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে যা একটি থায়োএস্টার বন্ধন দ্বারা কো-এনজাইম-A-এর সাথে যুক্ত হয়ে **২-কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল Co-A**তে পরিণত হয় **(Co-A সংযুক্তিকরণ)**। এটি একটি তিন পর্ব বিক্রিয়া যার মাধ্যমে এক অণু CO_2, এক অণু $NADH + H^+$ এবং এক অণু অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি হয়। **অ্যাসিটাইল Co-A হলো গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস্ চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান।** তাই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল Co-A উৎপাদনকারী বিক্রিয়াকে Link Reaction (সংযোগ বিক্রিয়া) বলে।

DAT 21-22

প্রতি অণু গ্লুকোজের জন্য : (দু' অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের জন্য) বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$\underset{\text{পাইরুভিক অ্যাসিড}}{2C_3H_4O_3} + 2NAD + \underset{\text{কোএনজাইম}}{2HSCo\text{-}A} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \underset{\text{অ্যাসিটাইল Co-A}}{2C_2H_3O - SCo\text{-}A} + 2NADH + H^+ + 2CO_2$$

এক অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের জন্য বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$C_3H_4O_3 + NAD + HSCo\text{-}A \longrightarrow C_2H_3O\text{-}SCo\text{-}A + NADH + H^+ + CO_2$$

গ্লুকোজেনোলাইসিস : যে প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে গ্লুকোজেনোলাইসিস বলে। এটি উচ্চতর উদ্ভিদে ঘটে না, কারণ এদের গ্লাইকোজেন অনুপস্থিত। প্রধানত প্রাণীর যকৃতে সংঘটিত হয়, তবে বৃক্কেও হতে পারে।

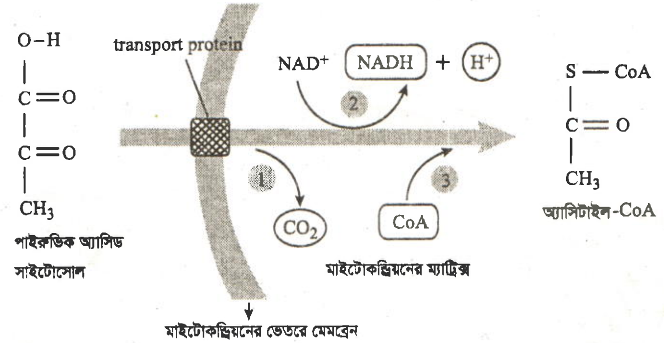

চিত্র ৯.৩২: পাইরুভিক অ্যাসিডের মাইটোকন্ড্রিয়নের ভেতরে প্রবেশ, অক্সিডেশন ও অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি।

৩। তৃতীয় ধাপ : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা ক্রেব্‌স চক্র : স্থান- মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স

যে চক্রপথে অ্যাসিটাইল CoA, অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে CO_2, শক্তি অণু (ATP, $FADH_2$, $NADH^+ + H^+$) উৎপন্ন করে এবং অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড পুনঃউৎপাদিত হয় **সেটি হলো ক্রেব্‌স চক্র।**

১। অ্যাসিটাইল Co-A, ম্যাট্রিক্স-এ অবস্থানরত চার কার্বনবিশিষ্ট **অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড**-এর সাথে যুক্ত হয়ে ৬-কার্বনবিশিষ্ট **সাইট্রিক অ্যাসিড** সৃষ্টি করে এবং Co-A পৃথক হয়ে যায়। সাইট্রেট সিনথেজ এনজাইম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী। ম্যাট্রিক্স-এ স্থায়ী অবস্থানের কারণে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে **আবাসিক অণু** বলা হয়। এ চক্রে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড বলে এ চক্রকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রও** বলা হয়।

২। সাইট্রিক অ্যাসিড আইসোমারিক পরিবর্তনে **আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। একোনিটেজ (aconitase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

৩। আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড CO_2 ও $2H^+$ হারিয়ে **আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু NAD হতে এক অণু $NADH+H^+$ এবং এক অণু CO_2 সৃষ্টি হয়। আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ (isocitrate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

৪। আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, Co-A এর সাথে মিলিত হয়ে **সাকসিনাইল Co-A** গঠন করে। এখানে এক অণু NAD হতে এক অণু $NADH + H^+$ এবং এক অণু CO_2 সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ (α-ketogluterate dehydrogenase) এনজাইম সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

৫। সাকসিনাইল Co-A, Co-A হারিয়ে **সাকসিনিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনে এক অণু ATP (ADP + Pi = ATP) সৃষ্টি হয়। Co-A পৃথক হয়ে যায়। সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ (Succinyl Co-A synthetase) এনজাইম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

৬। সাকসিনিক অ্যাসিড, $2H^+$ হারিয়ে **ফিউমারিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু FAD হতে এক অণু $FADH_2$ তৈরি হয়। সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (Succinate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

৭। ফিউমারিক অ্যাসিড এক অণু পানি গ্রহণ করে **ম্যালিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। ফিউমারেজ (fumarase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

[উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানিগণ আবিষ্কার করেন যে, বায়ুর অনুপস্থিতিতে কোষে ইথানল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় কিন্তু বায়ুর উপস্থিতিতে কোষ O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। জার্মানিতে জন্ম নেয়া ইংরেজ প্রাণ-রসায়নবিদ Sir Hans Adolf Krebs (1900–1981) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। এ জারণ প্রক্রিয়ার অধিকাংশ বিক্রিয়া একটি চক্রের আকারে আবর্তিত হয়। চক্রটি আবিষ্কারকের নামানুসারে একে **ক্রেব্‌স চক্র** বলা হয়। এ চক্রের প্রথম উৎপন্ন এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড, তাই এ চক্রকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রও** বলা হয়। সাইট্রিক অ্যাসিডে ৩টি কার্বোক্সিল (–COOH) গ্রুপ থাকায় এ চক্রকে **ট্রাই কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড** (TCA) চক্রও বলা হয়। ক্রেব্‌স তাঁর এ বিশেষ আবিষ্কারের জন্য ১৯৫৩ সালে রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান।] এ চক্রকে অ্যাম্ফিবোলিক পথ (Amphibolic pathway, একই সঙ্গে অপচিতি ও উপচিতিমূলক ক্রিয়া উভয়ই পরিলক্ষিত হয়) বলা হয়।

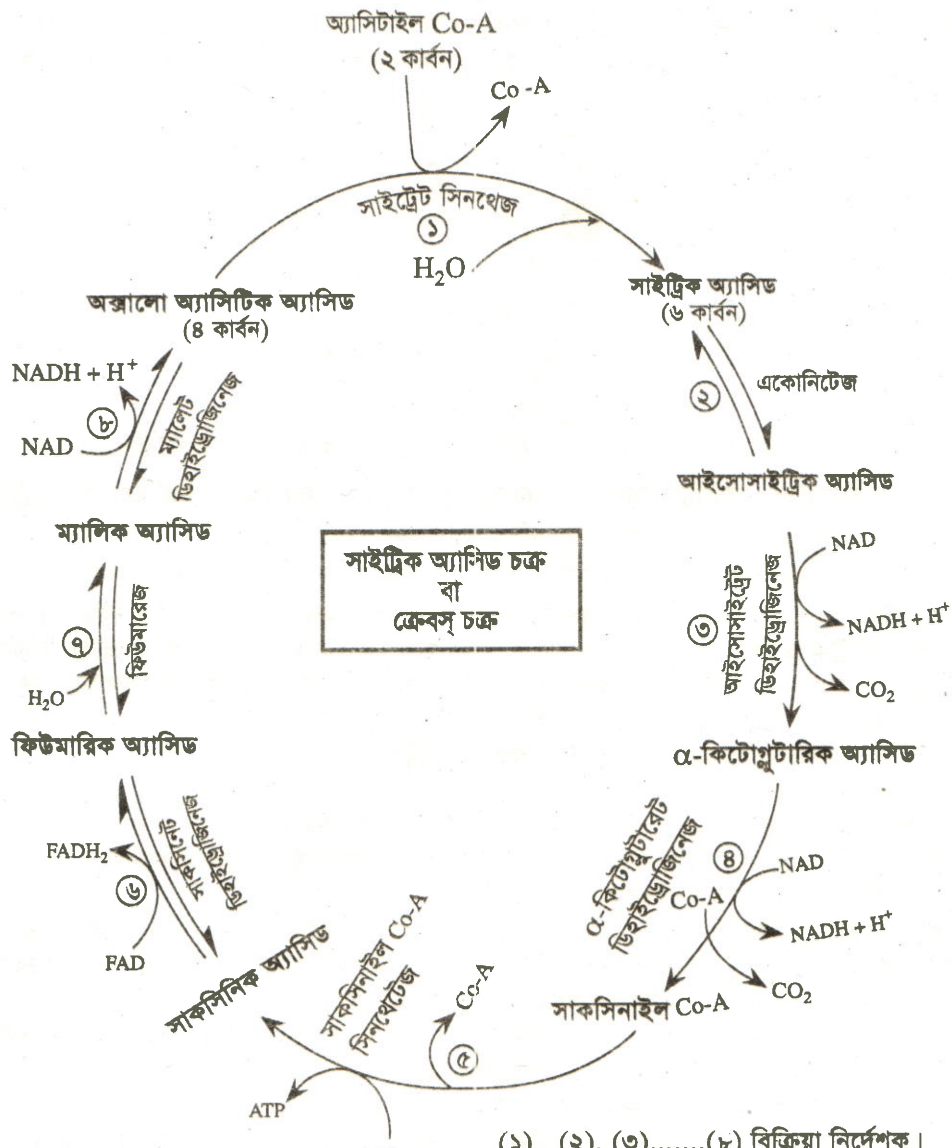

(১), (২), (৩).......(৮) বিক্রিয়া নির্দেশক।

চিত্র ৯.৩৩ : ক্রেব্স চক্রের সংক্ষিপ্ত ছক : আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ছকটি উপস্থাপিত, এতে দুটি স্টেপ কম আছে।
Ref : L. Taiz and E.Z. Eiger : Plant Physiology (second edition-1998) Sinauer Associates, Inc. Publishers. USA.

৮। ম্যালিক অ্যাসিড $2H^+$ হারিয়ে **অক্সালো অ্যাসিটিক** অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু NAD হতে এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন হয়। ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ (malate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এ চক্রে পুনঃপুনঃ উৎপাদিত হয় এবং পুনঃপুনঃ অংশগ্রহণ করে চক্রটি চালু রাখে।

একটি সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে অংশগ্রহণকারী ও উৎপাদন নিম্নরূপ :

অ্যাসিটাইল Co-A + $3NAD^+$ + FAD + ADP + $P_i \rightarrow 2CO_2$ + 3NADH + $3H^+$ + $FADH_2$ + ATP + Co-A

এক অণু গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন CO_2

গ্লাইকোলাইসিস = O, পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন = $2CO_2$; ক্রেবসচক্র = $4CO_2$;

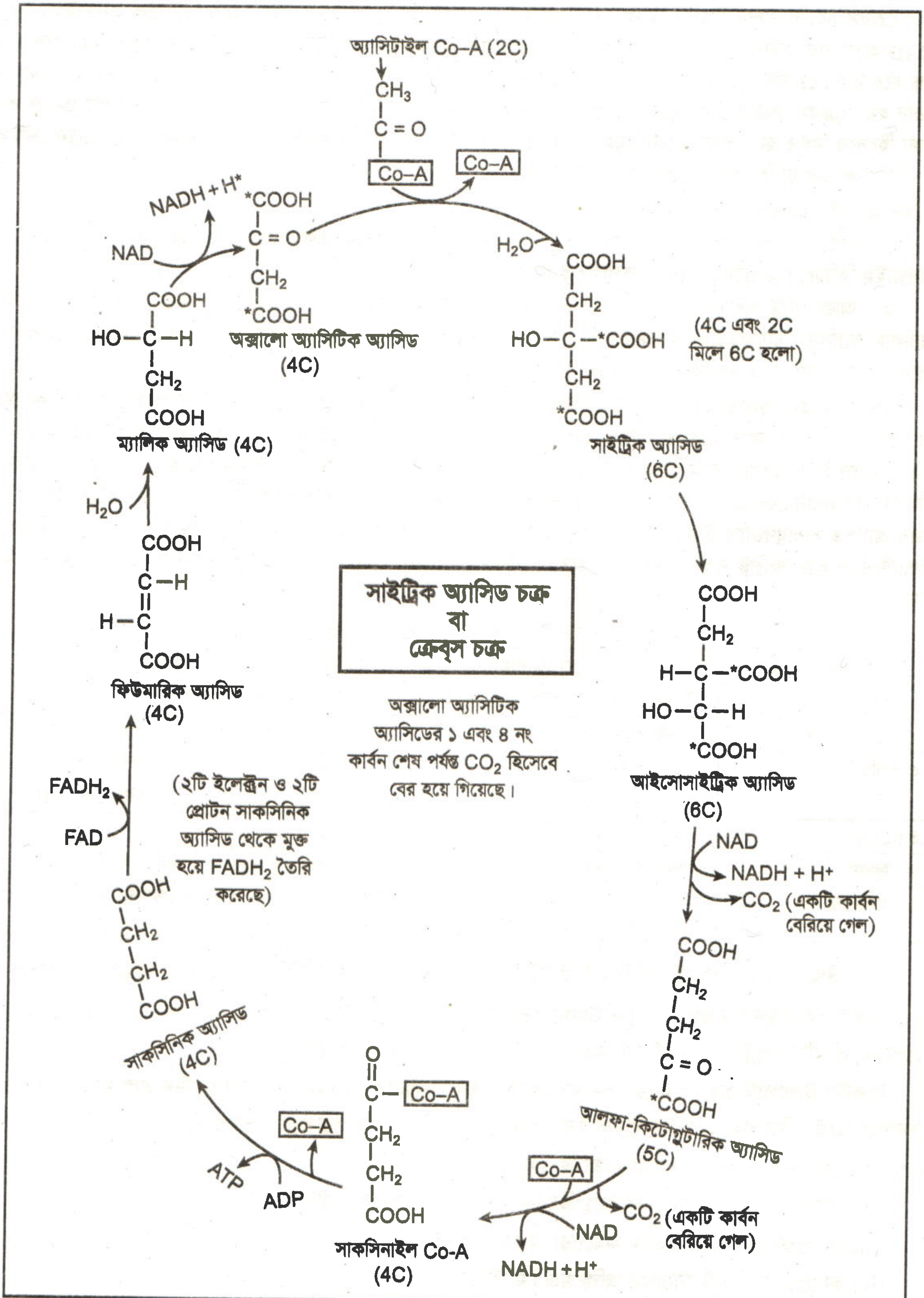

শিক্ষক এবং অগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য। মুখস্থ করার দরকার নেই।

ক্রেবস্ চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম (অ্যালোস্টেরিক এনজাইম)। ADP, NAD হলো এর উদ্দীপক; ATP এবং NADH + H^+ হলো ইনহিবিটর। ATP বা NADH + H^+ বেশি জমা হলে এ চক্র বন্ধ হয়ে যায়। ক্রেবস্ চক্রে প্রতি গ্লুকোজ অণু হতে ৪ অণু CO_2, ৬ অণু NADH + H^+, ২ অণু $FADH_2$ এবং ২ অণু ATP তৈরি হয়। ক্রেবস্ চক্রের শেষে গ্লুকোজ অণুটি সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কার্বন ও অক্সিজেন CO_2 হিসেবে প্রকাশ পায় ও বর্জ্য হিসেবে নির্গত হয়। হাইড্রোজেনসমূহ NADH + H^+ এবং $FADH_2$ গ্রহণ করে। হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে থেকে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রেবস্ চক্রের পার্থক্য

১। উদ্ভিদে সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ ATP তৈরি করে কিন্তু প্রাণীতে GTP তৈরি হয়। GTP পরে একটি এনজাইম বিক্রিয়ার মাধ্যমে ATP-তে রূপান্তরিত হয়।

২। আজ পর্যন্ত পরীক্ষাকৃত সকল উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়াতে NAD-malic enzyme পাওয়া গিয়েছে। এ এনজাইম ম্যালিক অ্যাসিড (ম্যালেট)কে পাইরুভিক অ্যাসিড-এ রূপান্তরিত করে যা অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস্ চক্রে প্রবেশ করে। প্রাণীতে এরূপ বিক্রিয়া ঘটে না।

ক্রেবস্ চক্রের গুরুত্ব : (১) একটি জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ক্রেবস্ চক্র থেকেই পাওয়া যায়। (২) ক্রেবস্ চক্রে উৎপাদিত একাধিক জৈব অ্যাসিড উদ্ভিদের অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (৩) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন সাক্‌সিনিক অ্যাসিড ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টির সাবস্ট্রেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (৪) ক্রেবস্ চক্র শক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। শ্বসনে উৎপাদিত শক্তির অধিকাংশই এ চক্রের মাধ্যমে ঘটে। (৫) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড সাধারণভাবে উদ্ভিদের জৈব অ্যাসিড বিপাকে অংশগ্রহণ করে। (৬) থাইমিন, সাইটোসিন, পোরফাইরিন, হিম ইত্যাদিও এ চক্র সংশ্লিষ্ট দ্রব্য থেকে তৈরি হয়ে থাকে। (৭) আমরা শ্বসনে যে CO_2 ত্যাগ করি তা এ চক্র থেকেই উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস্ চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোলাইসিস	ক্রেবস্ চক্র
১। ধাপ	গ্লাইকোলাইসিস সবাত শ্বসনের প্রথম ধাপ।	ক্রেবস্ চক্র সবাত শ্বসনের তৃতীয় ধাপ।
২। সংঘটনের স্থান	কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়।
৩। শক্তি	উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ কম। ২টি ATP, ২টি NADH + H^+.	উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি। 2ATP, 6NADH + H^+ এবং 2 $FADH_2$
৪। CO_2	CO_2 উৎপন্ন হয় না।	CO_2 উৎপন্ন হয়।
৫। জারণ	শ্বসনিক বস্তুর আংশিক জারণ ঘটে।	শ্বসনিক বস্তুর সম্পূর্ণ জারণ ঘটে।
৬। প্রক্রিয়ার নাম	অপর নাম EMP পথ।	অপর নাম সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা TCA চক্র (Tricarboxylic Acid cycle)

৪। ৪র্থ ধাপ : ইলেকট্রন স্থানান্তর ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন : স্থান- মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন

এ ধাপে **ইলেকট্রন স্থানান্তর ও ATP উৎপন্ন হয়।** শ্বসনের ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপে সৃষ্ট NADH + H^+ ও $FADH_2$ হতে ইলেকট্রন, একটি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের (ETC) মাধ্যমে O_2 এ স্থানান্তর হয়।

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (যে চেইনের মাধ্যমে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়) একটি একক প্রোটিন এবং তিনটি মাল্টিপ্রোটিন কমপ্লেক্স নিয়ে গঠিত এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেনে অবস্থিত। কমপ্লেক্সসমূহ নিম্নরূপ :

(i) কমপ্লেক্স-I : NADH ডিহাইড্রোজিনেজ (মাল্টিপ্রোটিন)

(ii) কমপ্লেক্স-II : সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (একক :পেরিফেরাল প্রোটিন)

(iii) কমপ্লেক্স-III : সাইটোক্রোম কমপ্লেক্স (মাল্টিপ্রোটিন)

(iv) কমপ্লেক্স-IV : সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (মাল্টিপ্রোটিন)

এক কমপ্লেক্স থেকে অপর কমপ্লেক্সে ইলেকট্রন প্রবাহ দুটি চলনশীল (mobile) ইলেকট্রন সাটল (Shuttle)-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। একটি সাটল হলো ইউবিকুইনোন (UQ) যা মেমব্রেনের মাঝখানে থাকে। এটি ইলেকট্রনকে কমপ্লেক্স I ও II হতে কমপ্লেক্স III-এ নিয়ে যায়। আরেকটি সাটল হলো সাইটোক্রোম-c (Cyt.c) যা দু' মেমব্রেনের (বহিঃ ও অন্ত) মাঝখানে খালি জায়গায় থাকে। এটি কমপ্লেক্স III থেকে ইলেকট্রন কমপ্লেক্স IV-এ নিয়ে যায়।

ইলেকট্রন প্রবাহ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের (ETC) কমপ্লেক্স-I, NADH + H^+ হতে ইলেকট্রন গ্রহণ করে UQ-এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স III তে পৌঁছায়। NADH + H^+ ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে NAD^+ (অক্সিডাইজ্‌ড)-তে পরিণত হয়।

২। $FADH_2$ হতে ইলেকট্রন কমপ্লেক্স-II গ্রহণ করে UQ এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স-III তে পৌঁছায়। $FADH_2$ অক্সিডাইজ্‌ড হয়ে FAD^+ হয়।

৩। কমপ্লেক্স-III হতে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম-c (Cyt.c) এর মাধ্যমে কমপ্লেক্স-IV এ পৌঁছায়।

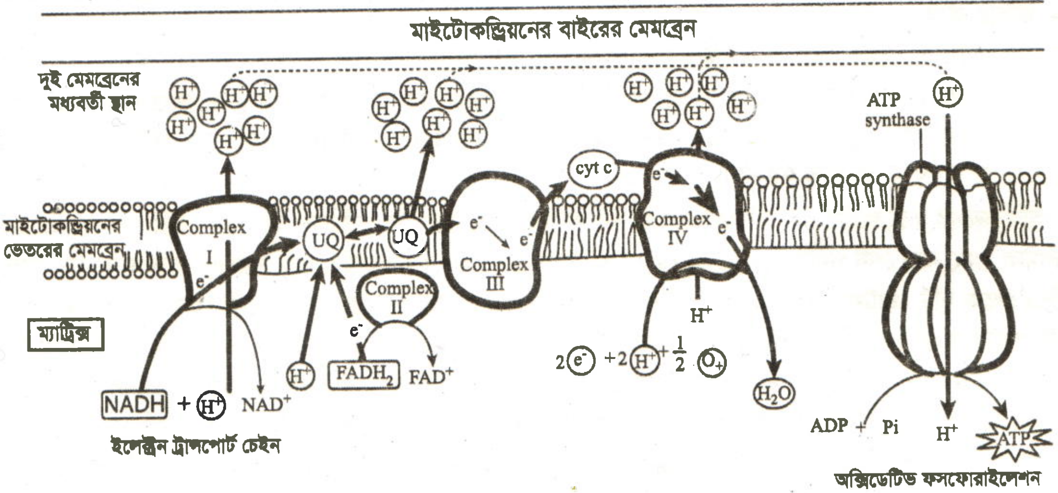

৪। মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স-এ বিদ্যমান অক্সিজেন, কমপ্লেক্স-IV হতে দুটি ইলেকট্রন এবং ম্যাট্রিক্স হতে দুটি প্রোটন ($2H^+$) গ্রহণ করে এক অণু পানি (H_2O) তৈরি করে। অক্সিজেনের শক্তিশালী ইলেক্ট্রোনেগিটিভিটির কারণে সৃষ্ট আকর্ষণে চেইনের মধ্যদিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয়ে পানি তৈরি করে। **ETC-তে কোনো ATP তৈরি হয় না।**

অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন : ATP তৈরি : ETC-এর মাধ্যমে ইলেকট্রন স্থানান্তরকালে নির্গত শক্তির সাহায্যে ADP ও Pi যুক্ত হয়ে ATP সৃষ্টি প্রক্রিয়া হলো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। ETC-এ কোনো ATP তৈরি হয় না, ATP তৈরি হয় কেমিঅসমোসিস প্রক্রিয়ায়। কেমিঅসমোসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট-এর শক্তি এবং ATP Synthase এনজাইম ব্যবহার করে ATP তৈরি হয়।

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ইলেকট্রন প্রদান করা কালে NADH + H^+, $FADH_2$ হতে বেশ পরিমাণ মুক্ত শক্তি (free energy) সৃষ্টি হয়। এ মুক্ত শক্তি খরচ করে পাম্পিং-এর মাধ্যমে ম্যাট্রিক্স থেকে প্রোটন (H^+) মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেন পার করে দু' মেমব্রেনের মাঝখানে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে ম্যাট্রিক্স-এ প্রোটন খুবই কম থাকে কিন্তু দু' মেমব্রেনের ফাঁকা স্থানে প্রোটন অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। প্রোটন ঘনত্বের এ পার্থক্যকে Proton gradient বলে, এ Proton gradient ও এক প্রকার শক্তি। মেমব্রেনের দু' পাশে প্রোটনের ঘনত্বের পার্থক্য এবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল পার্থক্য একটি শক্তি তৈরি করে যাকে Proton-motive force বলে। কোষের Proton-motive force ব্যবহার করে কাজ করাকে বলা হয় কেমিঅসমোসিস।

ব্রিটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ Peter Mitchell ATP সৃষ্টির এ প্রক্রিয়াটি প্রস্তাব করেছিলেন যার কারণে তাঁকে ১৯৭৮ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়াতে কেমিঅসমোসিসের শক্তি আসে NADH + H^+, $FADH_2$ ইত্যাদি উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুর অক্সিডেশনের মাধ্যমে। তাই এর নাম অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন।

ATP Synthase : এটি একটি আণবিক মটরবিশেষ। এর তিনটি অংশ আছে। যথা— গোড়া, মধ্যম অংশ বোঁটাবিশেষ এবং মোটা মাথার অংশ। গোড়ার অংশ মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেনে গ্রথিত থাকে এবং মাথা ম্যাট্রিক্স পর্যন্ত বর্ধিত থাকে। গোড়ার অংশ একটি সরু পথ তৈরি করে দেয় যার মধ্যদিয়ে প্রোটন (H^+) মুক্তভাবে চলার মাধ্যমে ম্যাট্রিক্স-এ পৌঁছাতে পারে। মাথার অংশ ঘূর্ণনের মাধ্যমে ADP + iP যুক্ত করে ATP তৈরিতে সহায়তা করে। **মাথার এ ঘূর্ণন অংশ প্রকৃতিতে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম রোটারি মটর।**

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের কাজ হলো NADH + H^+ এবং $FADH_2$ এর ইলেকট্রন ম্যাট্রিক্স-এর অক্সিজেনে প্রবাহিত করা।

উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়নের স্বকীয়তা

১। একটি বহিঃস্থ (ETC এর বাইরে) NADH + H^+ ডিহাইড্রোজিনেজ যা সরাসরি সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন NADH + H^+ থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করতে পারে। এ ইলেক্ট্রন পরে ETC-এর ইউবিকুইনোন পুল-এ প্রবেশ করে এবং **২টি** (৩টি নয়) ATP উৎপন্ন করে।

২। ম্যাট্রিক্স NADH + H^+ অক্সিডাইজ করার জন্য দুটি পথ আছে।

৩। অক্সিজেন রিডাকশনের জন্য বিকল্প পথ। এ বিকল্প অক্সিডেজ, সাইটোক্রোম-c অক্সিডেজের মতো নয়। এটি সায়ানাইড, অ্যাজাইড (azide) বা কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা বাধাগ্রস্ত (inhibition) হয় না। তাই এখানে সায়ানাইড প্রতিরোধী শ্বসন হয় যা প্রাণীতে হয় না।

অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা : সবাত শ্বসনের সব পর্যায়ে অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় না। অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ETC-এর শেষ পর্যায়ে কমপ্লেক্স- IV থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য। এক পরমাণু অক্সিজেন দুটি ইলেকট্রন ও ম্যাট্রিক্স থেকে দুটি প্রোটন ($2H^+$) গ্রহণ করে এক অণু পানি (H_2O) তৈরি করে। কোষে অক্সিজেন-এর অভাব হলে ETC-এর ইলেকট্রনের শেষ বাহক সাইটোক্রোম-সি থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার কেউ থাকে না, তাই সাইটোক্রোম-সি ইলেকট্রন মুক্ত করতে না পেরে পূর্ববর্তী বাহক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা হারায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে পেছনের সবগুলো বাহকই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এর ফলে প্রথমে ETC, পরে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র, পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন এবং সর্বশেষ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ATP উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তাই কোষ তার গঠন ও কার্যাবলি চালিয়ে যাবার মতো শক্তি (ATP) না পেয়ে মরে যায়।

আমাদের পেশি কোষগুলো ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় সীমিত ATP তৈরি করতে পারে কিন্তু প্রয়োজনীয় এনজাইম না থাকায় স্নায়ুকোষ (ব্রেইনসহ) তা পারে না। **ফলে অক্সিজেনের অভাব হলে প্রথমেই স্নায়ু কোষের মৃত্যু ঘটে।**

শ্বসনিক বস্তু : সুকরোজ প্রথমে ভেঙ্গে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হয়ে গ্লাইকোলাইসিস-এ প্রবেশ করে। গ্লুকোজ সরাসরি শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য মনোস্যাকারাইড প্রথমে গ্লুকোজ হয়, পরে শ্বসনে প্রবেশ করে। স্টার্চ, গ্লাইকোজেন পালিমার ভেঙ্গে প্রথমে গ্লুকোজ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। ফ্যাট ভেঙ্গে গ্লিসারোল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। গ্লিসারোল গ্লিসারেল্ডিহাইড-৩-ফসফেট হয়ে শ্বসনে অংশগ্রহণ করে, আর ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসিটাইল-Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়; এর কতক অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে, আর কতক সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে।

ফটোফসফোরাইলেশন ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ফটোফসফোরাইলেশন	অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন
১। কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান।	সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান।
২। কোন ক্ষুদ্রাঙ্গে ঘটে	ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে ঘটে।
৩। আণবিক O_2-এর প্রয়োজনীয়তা	আণবিক O_2-এর প্রয়োজন হয় না।	আণবিক O_2-এর প্রয়োজন হয়।
৪। ফটোসিস্টেম	ফটোসিস্টেম জড়িত।	ফটোসিস্টেম জড়িত নয়।
৫। শক্তির উৎস	শক্তির মূল উৎস সূর্যালোক।	ইলেকট্রন পরিবহণের সময় জারণ-বিজারণের ফলে শক্তি মুক্ত হয় এবং তা দিয়ে ATP তৈরি হয়।

শক্তি উৎপাদনের পরিসংখ্যান

সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও পানি উৎপাদনকালে নিম্নরূপ শক্তি উৎপাদন করে :

গ্লাইকোলাইসিস	পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন	ক্রেবস চক্র	ETC	সর্বমোট ATP
2ATP	....	....	................→	= 2ATP
$2NADH + H^+$ (যা সাইটোপ্লাজম থেকে ১টি ATP খরচ করে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করে। তাই ETC-তে প্রতি $NADH + H^+$ ৩টি ATP এর পরিবর্তে ২টি ATP উৎপন্ন করে।	....	....	$2 \times 2 = 4$ ATP	= 4ATP
	$2NADH + H^+$..............	....	$2 \times 3 = 6$ ATP	= 6ATP
		$6NADH + H^+$	$6 \times 3 = 18$ ATP	= 18ATP
		$2FADH_2$	$2 \times 2 = 4$ ATP	= 4ATP
		2ATP....................	................→	= 2ATP
			32 ATP	= 36ATP

এখানে উল্লেখ্য যে, এক মোল গ্লুকোজকে পোড়ালে ৬৮৬ কিলোক্যালরি শক্তি বের হয় কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে মাত্র ৩৬০ কিলোক্যালরি কার্যকরী শক্তি পাওয়া যায় এবং বাকি শক্তি তাপশক্তি হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রতিটি ATP হতে মাত্র ১০ কিলোক্যালরি হিসেবে **৩৬টি** ATP হতে ৩৬০ Kcal শক্তি সরবরাহ হয়, যার ফলে কার্যক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ৫৫.৪% বা তারও কম। অনেকের মতে ৪০%।

(খ) অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration)

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। **যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না বা, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে।**

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} 2\ \underset{\text{ইথানল}}{C_2H_5OH} + 2CO_2 + 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

অবাত শ্বসন দুটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়; যথা : ১। গ্লাইকোলাইসিস ও ২। পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

১। **গ্লাইকোলাইসিস** : এটি সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার অনুরূপ, গ্লাইকোলাইসিস উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পর্যায়। এ ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে ২ অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, ২ অণু $NADH + H^+$ ও ২ অণু ATP উৎপন্ন হয়।

২। **পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ : পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ইথানল অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি** : অবাত শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল ও CO_2 অথবা শুধু ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে।

(i) **অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন তথা ইথানল সৃষ্টি** : এটি দু' ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে কার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 বের করে দিয়ে অ্যাসিটেল্ডিহাইড উৎপন্ন করে এবং দ্বিতীয় ধাপে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় অ্যাসিটেল্ডিহাইড, $NADH + H^+$ হতে দুটি হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) উৎপন্ন করে এবং NAD মুক্ত হয়ে যায়। ঈস্ট এবং কতিপয় ব্যাকটেরিয়াতে এ প্রক্রিয়া ঘটে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$\text{(I)}\ \underset{\text{পাইরুভিক অ্যাসিড}}{CH_3-CO-COOH} \xrightarrow[\text{কার্বোক্সিলেজ}]{\nearrow CO_2} \underset{\text{অ্যাসিটেল্ডিহাইড}}{CH_3-CHO}$$

$$\text{(II)}\ \underset{\text{অ্যাসিটেল্ডিহাইড}}{CH_3-CHO} \xrightarrow[\text{অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH + H^+ \quad NAD} \underset{\text{ইথানল}}{CH_3-CH_2OH}$$

সর্বাধুনিক তথ্য (২০১৯) : গ্লাইকোলাইসিস-এর প্রতি $NADH + H^+$ থেকে ১.৫ ATP, অন্যান্য প্রতি $NADH + H^+$ থেকে ২.৫ ATP, প্রতি $FADH_2$ থেকে ১.৫ ATP কাজেই মোট ATP উৎপাদন = ৩০টি (৩৮ বা, ৩৬ নয়)। কেবলমাত্র শিক্ষকদের জানার জন্য।

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙ্গে ২ অণু ইথাইল অ্যালকোহল ও ২ অণু CO_2 উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 2\,ADP + 2\,Pi \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5OH} + 2CO_2 + 2\,ATP = 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিসে $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়েছিল তা এক্ষেত্রে খরচ হয়ে গেল। কাজেই অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় জমানো দুটি ATP-ই শক্তির একমাত্র উৎস। দুটি ATP হতে শেষ পর্যন্ত ১০ × ২ = ২০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ইথানল ও ল্যাকটিক অ্যাসিড টক্সিক, তাই এ প্রক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বলা হয়।

[ঈস্ট ছত্রাক হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় ছত্রাক। এটি যখন সবাত শ্বসন থেকে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করে তখন সমপরিমাণ শক্তির জন্য ১৮ গুণ দ্রুত গ্লুকোজ মেটাবলাইজ করে। পুনরায় বায়বীয় অবস্থায় এলে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পায়। বায়বীয় (aerobic) শ্বসনে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পাওয়াকে বলা হয় pasteur effect.]

(ii) ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি : ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড $NADH + H^+$ হতে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টিকালে কোনো CO_2 উৎপন্ন হয় না। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয় না। **কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও প্রাণীতে, বিশেষ করে পেশিতে, ল্যাকটিক অ্যাসিড অধিক উৎপন্ন হয়। অবাত শ্বসন অধিকাংশ আণুবীক্ষণিক জীবেরই শক্তি উৎপাদনের একমাত্র প্রক্রিয়া।**

$$\underset{\text{পাইরুভিক অ্যাসিড}}{CH_3{-}CO{-}COOH} \xrightarrow[\text{ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH + H^+ \;\rightarrow\; NAD} \underset{\text{ল্যাকটিক অ্যাসিড}}{CH_3{-}CHOH{-}COOH}$$

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ হতে ২ অণু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 2\,ADP + 2Pi \longrightarrow \underset{\text{ল্যাকটিক অ্যাসিড}}{2C_3H_6O_3} + 2ATP = 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন (Fermentation) [MAT 12-13]

কোষের বাইরে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জাইমেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ অণু অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল (অ্যালকোহল) বা ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি ও অল্প পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলে। কিছু ব্যাক্টেরিয়া ও এককোষী ঈস্টে ফার্মেন্টেশন ঘটে। বিজ্ঞানের যে শাখায় ফার্মেন্টেশন সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয় তাকে **জাইমোলোজি** (Zymology) বলে। এ প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল, মদ, পাউরুটি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ফরাসি রসায়নবিদ **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur, 1865) ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ঈস্টের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন এবং একে অক্সিজেনবিহীন শ্বসন হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

প্রকৃতকোষী এবং আদিকোষী জীবে শ্বসনের স্থান

প্রকৃতকোষী	আদিকোষী
(ক) **মাইটোকন্ড্রিয়নের বাইরে** (সাইটোপ্লাজমে) ১। গ্লাইকোলাইসিস ২। ফার্মেন্টেশন (খ) **মাইটোকন্ড্রিয়নের ভেতরে ম্যাট্রিক্স-এ :** ৩। পাইরুভিক অ্যাসিড অক্সিডেশন ৪। ক্রেব্স চক্র (গ) **মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেন-এ** ৫। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন।	(ক) **সাইটোপ্লাজমে** ১। গ্লাইকোলাইসিস ২। ফার্মেন্টেশন ৩। ক্রেব্স চক্র (খ) **প্লাজমামেমব্রেনের ভেতরের তল** (inner surface) ৪। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন।

বিভিন্ন শিল্পে অবাত শ্বসন তথা ফার্মেন্টেশনের ব্যবহার : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক শিল্প। নিচে সংক্ষেপে এর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:

(i) **বেকারি শিল্পে :** ঈস্টের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াকে এ শিল্পে কাজে লাগানো হয়। ময়দা-চিনির সাথে ঈস্ট যোগ করে পাউরুটি তৈরি করা হয়। ময়দা-চিনি ইত্যাদি উপকরণের সাথে মিশ্রিত ঈস্টের অবাত শ্বসনের ফলে সৃষ্টি হয় CO_2 এবং ইথাইল অ্যালকোহল। CO_2 গ্যাস-এর চাপে পাউরুটি ফুলে ফাঁপা হয়; আর অ্যালকোহল তাপে বাষ্প হয়ে উবে যায়।

(ii) **মদ্য শিল্পে :** ঈস্টের অবাত শ্বসন তথা ফার্মেন্টেশনকে কাজে লাগিয়ে মদ তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের রস থেকে **ওয়াইন** এবং আপেলের রস থেকে **সিডার** প্রস্তুত করা হয়।

(iii) **অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে :** শর্করার সাথে ঈস্টের ফার্মেন্টেশন বিক্রিয়ায় **ইথাইল অ্যালকোহল** তৈরি হয়। দর্শনা চিনি কলে চিটাগুড় (molasses) থেকে এ প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় **বিউটানল, প্রপানল** ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়।

(iv) **দুগ্ধ শিল্পে :** দুধের সাথে *Lactobacillus helveticus, Streptococcus lactis* ইত্যাদি ব্যাক্টেরিয়া মিশিয়ে ৩–৫ ঘণ্টার মধ্যে 37–38°C তাপমাত্রায় দই তৈরি করা হয়। এটিও ব্যাক্টেরিয়ার অবাত শ্বসনের ফল। পনির ও মাখন তৈরিতেও একই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

(v) **আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে :** অনেক আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ড্রাগের মিশ্রণের সাথে চিটাগুড় দিয়ে পাত্র ঢেকে দেয়া হয় (এমনকি মাটির নিচে বেশ কিছুদিন রাখা হয়)। এতে চিটাগুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় যাতে বিভিন্ন ড্রাগের ওষুধিগুণ অ্যালকোহল কর্তৃক শোষিত হয়।

(vi) **চা, তামাক ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে :** *Bacillus megatherium* নামক ব্যাক্টেরিয়া, চা ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং ফলে সবুজপাতা তাম্র বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। কফি শিল্পেও এর প্রয়োগ আছে।

(vii) **মাংস ও মাছ শিল্পে :** বিভিন্ন ঈস্ট ও কতিপয় ছত্রাক *(Penicillium, Aspergillus)*, ব্যাক্টেরিয়া *(Pedicoccus cerevisiae, Bacillus* sp.) ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে মাংসজাত দ্রব্য, যেমন—দক্ষিণ আমেরিকায় কিউরেডহ্যাম (Curedham), মাছ হতে তৈরি জাপানে কাতসুবুশি (Katsuobushi) প্রভৃতি।

(viii) **ভিটামিন তৈরিতে :** থিয়ামিন ও রিবোফ্ল্যাবিন নামক ভিটামিন B_1 ও B_2 এ প্রক্রিয়ায় ঈস্টের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

(ix) **ভিনেগার উৎপাদন :** গুড়ের মধ্যে ঈস্ট মিশিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এতে *Acetobacter aceti* নামক ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে জারণ ক্রিয়ায় অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা ভিনেগার উৎপন্ন করা হয়।

(x) **কোমল পানীয় শিল্পে :** বিভিন্ন প্রকার কোমল পানীয়ের প্রধান উপাদান সাইট্রিক অ্যাসিড গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়।

(xi) **চর্ম শিল্পে :** চামড়া শিল্পে চামড়া থেকে পশুর লোম ওঠিয়ে ফেলার জন্য এবং চর্বি ও অন্যান্য টিস্যু আলাদা করার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যাক্টেরিয়া *(Bacillus subtilis)* ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজনের ফলে চামড়া থেকে লোম, মেদটিস্যু ইত্যাদির অপসরণ ঘটে।

অবাত শ্বসন ও ফার্মেন্টেশন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অবাত শ্বসন	ফার্মেন্টেশন (গাঁজন)
১. ক্রিয়াস্থল	এটি জীবিত কোষের মধ্যে ঘটে।	এটি জীবিত কোষের বাইরে ঘটে।
২. কোথায় হয়	উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে হয়।	শুধুমাত্র ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়ার মতো নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে হয়।
৩. মাধ্যম	কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।	তরল মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।
৪. বিক্রিয়ার স্থান	এতে কোষের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন এনজাইম সরাসরি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	এতে কোষের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন এনজাইম কোষের বাইরে নিঃসৃত হয়ে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।
৫. গ্লুকোজ-এর উৎস	দেহের অভ্যন্তরীণ গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।	বাহ্যিক গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
৬. এনজাইম প্রকৃতি	কার্বোক্সিলেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ প্রভৃতি এনজাইমের কার্যকারিতায় ঘটে।	জাইমেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতায় ঘটে।
৭. উৎপন্ন বস্তুর অবস্থান	এ প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতরে অ্যালকোহল ও CO_2 সঞ্চিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে অ্যালকোহল ও CO_2 সঞ্চিত হয়।

শ্বসনিক হার/কোশেন্ট (Respiratory quotient/R.Q) : শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার (R.Q) বলে। বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর জন্য শ্বসনিক হার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্বসনিক বস্তু যদি গ্লুকোজ হয় তবে এটি সবাত শ্বসনের মাধ্যমে ৬ অণু CO_2 ত্যাগ করে এবং ৬ অণু O_2 গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে শ্বসন হার নির্ণয়ের জন্য নিম্নের সমীকরণ ব্যবহার করা হয়:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6H_2O$$

কাজেই সবাত শ্বসনের (গ্লুকোজের) শ্বসনিক হার (R.Q) $= \dfrac{\text{নির্গত } CO_2 \text{ এর অণুর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর অণুর পরিমাণ}}$

$$\therefore R.Q = \frac{6CO_2}{6O_2} = \frac{6}{6} = 1$$

শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট, জৈব অ্যাসিড, চর্বি ও আমিষ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে জারিত হয়। শ্বসনিক বস্তু ও শ্বসনের ধরনের ওপর শ্বসন হার (R.Q) ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। যেমন–

ম্যালিক অ্যাসিডের $R.Q = \dfrac{4CO_2}{3O_2} = \dfrac{4}{3} = 1.33$

ওলিক অ্যাসিডের $R.Q = \dfrac{36CO_2}{51O_2} = \dfrac{36}{51} = 0.71$

আমিষে O_2 এর পরিমাণ কম থাকে এবং আমিষ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হলে এদের R.Q এর মান 1 এর কম হয়ে থাকে।

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ (Factors of Respiration) : নিম্নলিখিত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ শ্বসন ক্রিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে:

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ (External factors) :

১। **তাপমাত্রা :** শ্বসন ক্রিয়া কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি, আর এ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর হার বিভিন্ন উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু উৎসেচকসমূহের কার্যকারিতা তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল সেহেতু তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি শ্বসনের হারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাপমাত্রা 0° সে. থেকে 30°C সে. পর্যন্ত বাড়ার সাথে সাথে শ্বসন হারও ক্রমাগত বাড়ে। 0°C শ্বসন হার খুবই কম থাকে। সাধারণত 20°–35°C তাপমাত্রায় শ্বসন প্রক্রিয়া ভালোভাবে চলে। 45°C এর ওপরের তাপমাত্রায় উৎসেচকসমূহের বিক্রিয়ার হার তথা শ্বসনের হার বেশ কমে যায়।

২। **অক্সিজেন :** পাইরুভিক অ্যাসিডের পূর্ণাঙ্গ জারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। অতএব কেবল সবাত শ্বসনেই অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে।

৩। **পানি :** কতগুলো বিক্রিয়ায় পানির প্রয়োজন হয়, অতএব প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহও শ্বসন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

৪। **আলো :** শ্বসনকার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্যি কিন্তু দিনের বেলায় আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকায় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।

৫। **কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর ঘনত্ব :** বায়ুতে CO_2-এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার কিঞ্চিৎ কমে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ (Internal factors) :

১। **জটিল খাদ্যদ্রব্য :** সরল খাদ্য গ্লুকোজ শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান শ্বসনিক বস্তু। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় কোষস্থ জটিল খাদ্যই গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। কাজেই জটিল খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **উৎসেচক :** শ্বসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অসংখ্য উৎসেচক অংশগ্রহণ করে, তাদের উপস্থিতির ওপরই সম্পূর্ণ শ্বসন প্রক্রিয়াটি নির্ভরশীল।

৩। **কোষের বয়স** : যে কোষে প্রোটোপ্লাজম অধিক (অল্প বয়সের) সেসব কোষ শ্বসন হার অধিক হয়।

৪। **কোষস্থ অজৈব লবণ** : কোষে অজৈব লবণ অধিক পরিমাণে থাকলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৫। **কোষ মধ্যস্থ পানি** : কোষে প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে শ্বসন হার কমে যায়।

৬। **মাটিতে অজৈব লবণ** : মাটিতে NaCl, KCl, CaCl ও MgCl এর দ্রবণের সরবরাহ বৃদ্ধি ঘটিয়ে শ্বসন হার বৃদ্ধি করা যায়।

৭। **অন্যান্য প্রভাবক** : আঘাতপ্রাপ্ত টিস্যুতে আঘাত নিরাময়ের জন্য কোষ বিভাজন দ্রুততর হয়, ফলে শ্বসন হার বেড়ে যায়। হাত দিয়ে পাতা মৃদু ঘষে দিলে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়।

শ্বসনের গুরুত্ব (Importance of Respiration)

যেকোনো জীবের জীবনে শ্বসনের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষেই শ্বসন প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া মানেই জীব বা সে জীব কোষের মৃত্যু হওয়া। নিচে উদ্ভিদ জীবনে শ্বসনের গুরুত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১। **জীবের দেহে শক্তি সরবরাহ** : জীবের প্রতিটি প্রক্রিয়া (যা জীবনের বৈশিষ্ট্য) পরিচালনার জন্য শক্তির প্রয়োজন, আর এ শক্তি আসে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবের সকল জৈবিক প্রক্রিয়া পরিচালিত করার মধ্যেই রয়েছে যেকোনো জীবের জীবনে শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রকৃত গুরুত্ব।

২। **খাদ্য প্রস্তুত** : শ্বসন প্রক্রিয়ায় নির্গত CO_2 প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং খাদ্য উৎপন্ন করে। সে খাদ্য যেমন উদ্ভিদ জীবনকে রক্ষা করে, তেমনই আবার সমগ্র প্রাণী জগতকেও রক্ষা করে।

৩। **খনিজ লবণ পরিশোষণ** : উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণে শ্বসন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্বসনের হার কম হলে লবণ পরিশোষণ হার কমে যায় এবং বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৪। **কোষ বিভাজন ও দৈহিক বৃদ্ধি** : শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাব কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার ওপরও প্রতিফলিত হয়। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া হতে আসে। তাই এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **তাপমাত্রা রক্ষা** : শ্বসনে সৃষ্ট তাপ জীবদেহের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৬। **এনজাইম ও জৈব অ্যাসিড উৎপাদন** : এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব অ্যাসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রমেও সহায়তা করে।

৭। **বায়ুমণ্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষা** : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হতে CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 বর্জিত হয় কিন্তু শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হতে O_2 গৃহীত হয় এবং CO_2 বর্জিত হয়, তাই বায়ুমণ্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৮। **শিল্পে ব্যবহার** : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে গড়ে ওঠেছে অ্যালকোহল, মদ, সিরকা, আচার, মাছ ও মাংসের সস ইত্যাদি উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৯। **বেকারি ও দুগ্ধজাত শিল্প** : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় বেকারি (পাউরুটি) ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (দই, পনির) উৎপাদন করা হয়।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সকল এনজাইম সার্বজনীনভাবে বহু ব্যাকটেরিয়া, সকল প্রোটিস্ট, সকল ছত্রাক, সকল প্রাণী এবং সকল উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, এরা সবাই একই ধরনের জেনেটিক তথ্য তথা একই ধরনের DNA বহন করে। কাজেই এরা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
১। অক্সিজেন	মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।	মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
২। পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ	পাইরুভিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে।	পাইরুভিক অ্যাসিডের আংশিক জারণ ঘটে।
৩। CO_2 উৎপাদন	অধিক পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয় (৬ অণু)।	অল্প পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয় বা আদৌ উৎপন্ন হয় না (২ অণু)।
৪। পানি উৎপাদন	পানি উৎপন্ন হয়। (6 H_2O)	পানি উৎপন্ন হয় না।
৫। অ্যালকোহল ও ল্যাকটিক অ্যাসিড	উৎপন্ন হয় না।	উৎপন্ন হয়।
৬। শক্তি	ATP আকারে 36 ATP হতে ৩৬০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।	ATP আকারে 2 ATP হতে মাত্র ২০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।
৭। সংঘটনের স্থান	সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ঘটে।	মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে ঘটে।
৮। কোথায় ঘটে	অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে ঘটে।	কিছু অণুজীব, পরজীবী প্রাণী, বীজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঘটে।
৯। ATP উৎপাদন	36টি।	2 টি।

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সালোকসংশ্লেষণ	শ্বসন
১। শক্তির রূপান্তর	এ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক স্থির শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক স্থির শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
২। শক্তির অবস্থান	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয়।
৩। কোষের প্রকার	যেসব কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে কেবল সেসব কোষেই এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।	সব সজীব কোষেই এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।
৪। সূর্যালোকের আবশ্যকতা	সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।	দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা এ প্রক্রিয়া চলে।
৫। প্রধান উপাদান	পানি ও CO_2 প্রধান উপাদান।	জটিল খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে শর্করা ও O_2 প্রধান উপাদান।
৬। উৎপন্ন দ্রব্য	শর্করা ও O_2 উৎপন্ন হয়।	প্রধানত পানি ও CO_2 উৎপন্ন হয়। তবে CO_2 ও অ্যালকোহল এবং অনেক সময় শুধু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।
৭। পদার্থের গ্রহণ ও ত্যাগ	উদ্ভিদ CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে।	উদ্ভিদ O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে (সবাত শ্বসনে)।
৮। প্রক্রিয়ার ধরন	এটি একটি উপচিতি প্রক্রিয়া, তাই উদ্ভিদের ওজন বাড়ে।	এটি একটি অপচিতি প্রক্রিয়া, তাই উদ্ভিদের ওজন কমে।
৯। বিক্রিয়াস্থল	এ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াগুলো ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে থাকে।	এ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমে এবং শেষ পর্যায়ে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে থাকে।
১০। জীবের প্রকার	ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদে এ প্রক্রিয়া চলে।	সব উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এ প্রক্রিয়া চলে।

শ্বসন ও দহনের মধ্যে পার্থক্য

শ্বসন	দহন
১। কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়।	১। মুক্ত বায়ুতে সংঘটিত হয়।
২। এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	২। এটি একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
৩। অল্প পরিমাণে CO_2 সৃষ্টি হয়।	৩। বেশি পরিমাণে CO_2 সৃষ্টি হয়।
৪। অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপমাত্রায় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।	৪। উচ্চতাপমাত্রায় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।
৫। বিক্রিয়া উৎসেচক (এনজাইম) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	৫। বিক্রিয়া উৎসেচক (এনজাইম) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।
৬। কোনো আলোকশক্তি সৃষ্টি হয় না।	৬। আলোকশক্তি সৃষ্টি হয়।
৭। ATP হিসেবে শক্তি নির্গত হয়।	৭। তাপশক্তি হিসেবে শক্তি নির্গত হয়।
৮। কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হওয়ায় ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত হয়।	৮। একটি ধাপে সংঘটিত হওয়ায় খুব দ্রুত শক্তি নির্গত হয়।

ব্যবহারিক : অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাসের নির্গমন পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ : একটি টেস্টটিউব, একটি ছোটো বিকার, ক্ল্যাম্পসহ একটি স্ট্যান্ড, পারদ, কিছু সিক্ত ছোলাবীজ, কস্টিক পটাশ টুকরা, চিমটা।

কার্য পদ্ধতি : প্রথমে বিকারের অর্ধেক পরিমাণ পারদপূর্ণ করে নিতে হবে। পরে টেস্টটিউবটি সম্পূর্ণভাবে পারদপূর্ণ করে এর মুখ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বিকারে উপুড় করে রাখতে হবে। এবার টেস্টটিউবটি স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে এমনভাবে আটকাতে হবে যেন টেস্টটিউবের মুখ বিকারের তল স্পর্শ না করে অথচ পারদের মধ্যে ডুবানো থাকে। এবার কিছু খোসা ছড়ানো অঙ্কুরিত ছোলাবীজ চিমটা দিয়ে ধরে খুব সাবধানতার সাথে একটি একটি করে পারদের ভেতর দিয়ে টেস্টটিউবে ঢুকাতে হবে। বীজগুলো পারদের ওপরে চলে আসবে।

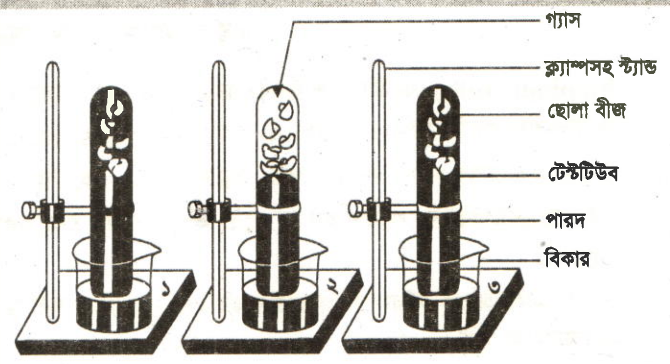

৯.৩৪ : অবাত শ্বসনে CO_2 গ্যাস নির্গত হওয়ার পরীক্ষা।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে টেস্টটিউবে পারদের উপরিতল ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে।

বিশ্লেষণ : টেস্টটিউবে পারদের উপরিতল নিচে নেমে আসছে কেন ? কারণ উক্ত সময়ে কোনো একটি গ্যাস সৃষ্টি হয়ে টেস্টটিউবে জমা হয়েছে এবং ঐ গ্যাসের চাপে পারদের তল নিচে নেমে আসছে। গ্যাসটি কী তা জানার জন্য এবার একটুকরা কস্টিক পটাশ টেস্টটিউবে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দেখা গেল টেস্টটিউবটি পুনরায় পারদপূর্ণ হয়েছে, কারণ কস্টিক পটাশ টুকরা গ্যাসটি শোষণ করে নিয়েছে।

সিদ্ধান্ত : আমরা জানি, কস্টিক পটাশ CO_2 গ্যাস শোষণ করে থাকে, কাজেই টেস্টটিউবে যে গ্যাস জমা হয়েছিল তা ছিল CO_2। আমরা জানি, শ্বসন প্রক্রিয়ায় CO_2 তৈরি হয়, কাজেই ছোলাবীজে শ্বসনক্রিয়া অব্যাহত ছিল। পারদের ভেতরে বাতাস থাকতে পারে না, কাজেই শ্বসন ক্রিয়া চলেছিল বাতাসমুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ এটি ছিল অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া।

সার-সংক্ষেপ

পত্ররন্ধ্র : Stomata-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে পত্ররন্ধ্র। এ রন্ধ্র পাতায় অধিক থাকে বলেই এরূপ বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে। পাতায় (সাধারণত নিম্নত্বকে) অবস্থিত দু'টি রক্ষীকোষ দ্বারা বেষ্টিত রন্ধ্রের নাম পত্ররন্ধ্র। পত্ররন্ধ্র বন্ধ হতে পারে, আবার খুলেও যেতে পারে। পানি শোষণ করে রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীত হলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, আবার পানি হারিয়ে রক্ষীকোষদ্বয় শিথিল হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ জীবনে পত্ররন্ধ্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রস্বেদন : প্রস্বেদন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার পথের ভিন্নতা অনুযায়ী প্রস্বেদন তিন প্রকার; যথা— পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, লেন্টিকুলার প্রস্বেদন

এবং কিউটিকুলার প্রস্বেদন। অধিকাংশ উদ্ভিদে দিনের আলোতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং প্রস্বেদন ঘটে। মরুভূমির মতো প্রখর সূর্যালোকের এলাকায় সাধারণত পত্ররন্ধ্র দিনে বন্ধ থাকে এবং রাত্রে খোলা থাকে, তাই মরু উদ্ভিদে প্রস্বেদন রাত্রে হয়ে থাকে। এটি উদ্ভিদের একটি অভিযোজন বৈশিষ্ট্য।

ফটোফসফোরাইলেশন : আলোকশক্তির সাহায্যে কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়া হলো ফটোফসফোরাইলেশন। প্রকৃতপক্ষে সূর্যশক্তির সাহায্যে ADP-এর সাথে এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে ATP তৈরি হওয়ার নামই ফটোফসফোরাইলেশন। অচক্রীয় ও চক্রীয়— এ দু প্রক্রিয়ায় ফটোফসফোরাইলেশন হয়ে থাকে। উদ্ভিদের জীবনে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ATP ব্যবহার করে সবুজ উদ্ভিদ শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাদ্যের ওপর উদ্ভিদসহ সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল।

সালোকসংশ্লেষণ : সালোকসংশ্লেষণ হলো সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্যালোকের শক্তিকে ATP ও NADPH + H^+ নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বোহাইড্রেট তথা শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ প্রক্রিয়ায় CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 উপজাত হিসেবে বের হয়ে যায়। সালোকসংশ্লেষণের আলোকনির্ভর অধ্যায়ে ATP ও NADPH + H^+ তৈরি হয় এবং আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ে শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। এ খাদ্যের ওপর সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল।

গ্লাইকোলাইসিস : শ্বসনের প্রাথমিক ধাপ হলো গ্লাইকোলাইসিস। এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দু' অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করে। পাইরুভিক অ্যাসিড পরে সবাত শ্বসনে অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস্ চক্র ও ETC-এ প্রবেশ করে শক্তি ও O_2 উৎপন্ন করে। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন All

১। **Stephan Hales** কে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের (উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা বা প্ল্যান্ট ফিজিওলজি) জনক বলা হয়।

২। ফিজিওলজি শব্দটি *Physis* (nature) এবং *Logos* (discourse) নামক দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত।

৩। উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ ও পুষ্টি, আয়ন হিসেবে (ক্যাটায়ন '+' বা অ্যানায়ন '–') শোষণ করে নেয়।

৪। **সবচেয়ে দ্রুতগতিতে** শোষিত হয় K^+ এবং NO_3^- আয়ন এবং সবচেয়ে **মন্থর গতিতে** শোষিত হয় Ca^{2+} এবং SO_4^{2-} আয়নদ্বয়।

৫। যেসব মৌল অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় (m mol/kg সর্বনিম্ন ৩০) তা হলো **ম্যাক্রোমৌল** বা বৃহৎ উপাদান। ম্যাক্রোমৌল ৯টি।

৬। যেসব মৌল অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় (m mol/kg ৩ বা তার কম) তা হলো **মাইক্রোমৌল**। মাইক্রোমৌল ৮টি।

৭। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন **হাইড্রোজেন**, ৬০,০০০ m mol/kg এবং সবচেয়ে কম প্রয়োজন **মলিবডেনাম**, ০.০০০১ m mol/kg।

৮। ম্যাক্রোমৌলগুলো মনে রাখার সহজ উপায় হলো "NKCafe for Magnesium **CHOPS**।

৯। **সক্রিয়** ও **নিষ্ক্রিয়** এ দু' উপায়ে উদ্ভিদে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

১০। ঘনত্বের আনতির বিপরীতে বিপাকীয় শক্তি খরচ করে যে শোষণ ঘটে তা হলো **সক্রিয় পরিশোষণ**।

১১। ব্যাপন, আয়ন-বিনিময়, ডোন্যান সাম্যাবস্থা এবং ব্যাপক প্রবাহ– এ চার পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ ঘটে থাকে।

১২। উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে **প্রস্বেদন** বলে। প্রস্বেদন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া।

১৩। পাতার (কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পাপড়ি) বহিঃত্বকে অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম রন্ধ্রকে **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোম্যাটা** বলা হয়।

১৪। পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে CO_2 ও O_2 গ্যাস বিনিময় হয়, উদ্ভিদদেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়, রক্ষীকোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে।

১৫। পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াতে আলোকবর্ণালির নীল আলো ও K^+ আয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১৬। একই তাপমাত্রা ও একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানের দিকে বিস্তার লাভ প্রক্রিয়াকে **ব্যাপন** বলা হয়।

১৭। কলয়েডজাতীয় শুষ্ক বা আধাশুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণ প্রক্রিয়াকে **ইমবাইবিশন** বলে।

১৮। সূর্যালোকের গতিশক্তিকে সঞ্চিত স্থির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষণ** বা **ফটোসিনথেসিস** বলা হয়।

১৯। সূর্যালোকের উদ্দীপনায় ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েডের অভ্যন্তরে পানি ভেঙ্গে অক্সিজেন, প্রোটন ও ইলেকট্রন উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ফটোলাইসিস** বা পানির **সালোকবিভাজন**।

২০। পানির সালোকবিভাজন ফটোসিস্টেম II এর সাথে সংশ্লিষ্ট; এর ফলেই ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় O_2 নির্গত হয়।

২১। **Photon** (ফোটন) হলো আলোকশক্তির একটি প্যাকেট বা দৃশ্যমান আলোর একটি কুয়ান্টাম (quantum)।

২২। ক্লোরোফিল অণুসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহীতাসমূহ এক সাথে একটি **ইউনিট** (একক) হিসেবে অবস্থান করে, এ ইউনিটকে **ফটোসিস্টেম** বলে।

২৩। প্রকৃতকোষী উদ্ভিদে **দু প্রকার** ফটোসিস্টেম থাকে; যথা–ফটোসিস্টেম-I (PS-1) এবং ফটোসিস্টেম-II (PS-1I)।

২৪। একটি ফটোসিস্টেমের ৩টি অংশ থাকে; যথা– (i) আলোক শোষণ অংশ, (ii) বিক্রিয়া কেন্দ্র এবং (iii) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)।

২৫। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ৩৯০ nm (বেগুনির শুরু) থেকে ৭৬০ nm (লাল-এর শেষ)।

২৬। দৃশ্যমান আলোর সাত বর্ণের আলোকচ্ছটাকে **লাইট স্পেকট্রাম** বা আলোকবর্ণালি বলে।

২৭। কোনো বস্তুর ওপর পতিত আলোর শোষিত পরমাণুকে **অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম** বা **শোষণবর্ণালি** বলা হয়।

২৮। সালোকসংশ্লেষণে ATP তৈরি হয় থাইলাকয়েড মেমব্রেনের স্ট্রোমার দিকে।

২৯। ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে যে থলে সাদৃশ্য অঙ্গাণু থাকে তাকে **থাইলাকয়েড** বলে।

৩০। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি প্রক্রিয়াকে **ফটোফসফোরাইলেশন** বলে।

৩১। কোনো বস্তুর সাথে ফসফেট সংযুক্ত হওয়াকে **ফসফোরাইলেশন** বলে।

৩২। ফসফোরাইলেশনের ফলে ঐ বস্তু অধিক **রিঅ্যাকটিভ** হয়।

৩৩। কার্বন বিজারণের বিক্রিয়াসমূহ ক্লোরোপ্লাস্টের **স্ট্রোমাতে** ঘটে।

৩৪। ক্যালভিন চক্রের CO_2 গ্রহীতা হলো RuBP (রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট)। রুবিস্কো এনজাইম CO_2 কে RuBP এর সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে।

৩৫। ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো তিন কার্বনবিশিষ্ট 3PGA (3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড)।

৩৬। যেসব উদ্ভিদে তিন কার্বনবিশিষ্ট 3PGA-এর মাধ্যমে কার্বন বিজারণের সূচনা ঘটে সেসব উদ্ভিদকে C_3 উদ্ভিদ বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ।

৩৭। Hatch & Slack গতিপথে CO_2 গ্রহীতা হলো ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড এবং প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হলো চার কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, তাই এ চক্র সম্পন্নকারী উদ্ভিদ হলো C_4 উদ্ভিদ।

৩৮। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় (i) তাপমাত্রা, (ii) আলোর তীব্রতা এবং (iii) CO_2 এর ঘনত্ব–এ তিনটি লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

৩৯। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় **লাল ও নীল আলো** সর্বাধিক সক্রিয়।

৪০। **শ্বসন** হলো শক্তি নির্গমনকারী কতিপয় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমষ্টি।

৪১। **মাইটোকন্ড্রিয়া** হলো শ্বসন ক্ষুদ্রাঙ্গ।

৪২। **শ্বসন** প্রক্রিয়ায় যেসব যৌগিক বস্তু জারিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয় সেসব **বস্তুই শ্বসনিক** বস্তু।

৪৩। শ্বসন দু প্রকার; যথা– (i) সবাত শ্বসন এবং (ii) অবাত শ্বসন।

৪৪। এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে দু অণু পাইরুভিক অ্যাসিড-এ পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **গ্লাইকোলাইসিস**।

৪৫। গ্লুকোজ অণু ৬-কার্বনবিশিষ্ট, পাইরুভিক অ্যাসিড অণু ৩-কার্বনবিশিষ্ট।

৪৬। মোট নয়টি বিক্রিয়ায় গ্লাইকোলাইসিস সম্পন্ন হয়, এর মধ্যে **১,৩ এবং শেষ এ ৩টি বিক্রিয়া একমুখী**।

৪৭। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয় এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সবগুলো এনজাইমই **দ্রবণীয়** এবং সাইটোপ্লাজমেই থাকে।

৪৮। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় ৪ অণু ATP, ২ অণু $NADH + H^+$ এবং দু' অণু পাইরুভিক অ্যাসিড; আর খরচ হয় এক অণু গ্লুকোজ এবং ২ অণু ATP।

৪৯। গ্লাইকোলাইসিস সম্পন্ন হয় কোষের সাইটোপ্লাজমে কিন্তু পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কোষস্থ মাইটোকন্ড্রিয়াতে।

৫০। পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে (মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে) অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **লিংক রিঅ্যাকশন** বলে।

৫১। এক অণু পাইরুভিক অ্যাসিড হতে সবাত শ্বসনে **৩-অণু CO_2, ৪-অণু $NADH + H^+$, ১-অণু $FADH_2$** এবং **১-অণু ATP** উৎপন্ন হয়।

৫২। এক অণু গ্লুকোজ হতে সবাত শ্বসনে উৎপন্ন হয় **১০-অণু $NADH + H^+$, ২-অণু $FADH_2$, ৪-অণু ATP** এবং **৬-অণু CO_2**।

৫৩। আমাদের পেশিকোষ O_2 বিহীন অবস্থায় কিছু ATP উৎপন্ন করতে পারে কিন্তু স্নায়ুকোষ তা পারে না, কারণ স্নায়ুকোষ ফার্মেন্টেশনের কোনো এনজাইম থাকে না।

৫৪। শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে **শ্বসনিক কোশেন্ট** (শ্বসন-হার) বলে। গ্লুকোজের শ্বসনিক কোশেন্ট $\frac{6\ CO_2}{6\ O_2} = ১$।

৫৫। **বায়োলজিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অক্সিডেন্ট হলো $P680^+$**।

৫৬। ক্লোরোফিল এটমে শক্তির উচ্চবলয় হতে e^- প্রাথমিক ইলেক্ট্রনগ্রহীতা গ্রহণ করলে ফটোসিনথেসিস-এর সূচনা ঘটে।

৫৭। প্রকৃতিতে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম রোটারি মটর হলো ATP thynthase-এর মাথার ঘূর্ণন অংশ।

৫৮। পৃথিবীতে প্রতি বছর রুবিস্কো এনজাইম ১০০ বিলিয়ন টন CO_2 কে কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। কোন উপাদানটি উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে?

(ক) অক্সিজেন (খ) হাইড্রোজেন (গ) নাইট্রোজেন (ঘ) কার্বন

২। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) এ উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(ii) বান্ডলসীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

(iii) মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'A' জীবটি O_2-এর দ্বারা শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কিন্তু 'B' জীবটি O_2 ছাড়া শ্বসন সম্পন্ন করে।

৩। 'A' জীবের শ্বসনের ধাপ হলো—

(i) গ্লাইকোলাইসিস।

(ii) পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

(iii) ক্রেব্‌স চক্র।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। 'B' জীবের শ্বসনের সাথে সর্বাধিক মিল আছে কোন উদ্ভিদের শ্বসনের?

(ক) অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (খ) বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া

(গ) পরজীবী ব্যাকটেরিয়া (ঘ) মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়া

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (গ)	২। (ক)	৩। (খ)	৪। (ক)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মানুষ খাদ্য তৈরি করতে পারে না কিন্তু আম, জাম, কাঁঠালসহ সকল সবুজ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে।

(ক) প্রস্বেদন কী?

(খ) লিমিটিং ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের উদ্ভিদগুলো কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে এবং খাদ্য তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম লেখ।

(ঘ) উক্ত উদ্ভিদগুলোর তৈরিকৃত খাদ্য মানবসভ্যতায় কী ধরনের অবদান রাখে; ব্যাখ্যা করো।

২। জীববিজ্ঞান শিক্ষক বললেন, উদ্ভিদ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে অন্য একটি জটিল প্রক্রিয়ায় ঐ খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। প্রক্রিয়া দুটি একে অপরের পরিপূরক।

(ক) C_3 উদ্ভিদ কী?

(খ) ETC বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকের ২য় প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্নের হিসাব দেখাও।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রক্রিয়া দুটি কীভাবে একে অপরের পরিপূরক—তা ব্যাখ্যা করো।

৩। আখের গুড়ের হাঁড়ির মুখটি ভালোভাবে বায়ুরোধী করে বেঁধে রাখা ছিল। কয়েক মাস পরে গুড় বের করতে গিয়ে দেখা গেল হাড়ির মুখে ফেনা ওঠে কেমন একটা গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। রনির ভাই (যিনি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক) বললেন, ওখানে যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে সেটিকে অবাত শ্বসন বললে ভুল হবে।

(ক) ফটোফসফোরাইলেশন কী?

(খ) সালোকসংশ্লেষণ বলতে কী বুঝ?

(গ) দৌড়বিদদের মাংসপেশিতে উক্ত প্রক্রিয়া ঘটলে কী হতে পারে?

(ঘ) গুড়ের হাঁড়িতে সংঘটিত প্রক্রিয়াটি কীভাবে শিল্পক্ষেত্রে সমাদৃত তা ব্যাখ্যা করো।